প্রাথমিক-শিক্ষা

শ্রীমতী রেণু মিত্র, এম-এ

ভূমিকা

শ্রীযুত অপূর্ব কুমার চন্দ
প্রিন্সিপাল, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পূজনীয় পিতামাতার ক্রোড়ে আমার প্রাথমিক শিক্ষা সহজভাবেই লাভ হইয়াছিল। আমার এই "প্রাথমিক-শিক্ষা" তাঁহাদেরই শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া একটু তৃপ্তি অনুভব করিতেছি।

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে খুব কম বইই লেখা হয়েছে। যে ক'খানা দেখবার সুযোগ আমার ঘটেছে, তাদের সব ক'টাই "অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক" তালিকার অন্তর্ভুক্ত হবার জন্যই রচিত। কাজেই তথ্য অনেক থাকলেও সাধারণ পাঠকের জন্য সহজপাঠ নয়। শ্রীমতী রেণু মিত্রের বইখানা তাই শঙ্কাকুল চিত্তেই পড়তে সুরু করি। কিন্তু কিছু পড়েই বুঝতে পারলুম যে বইখানা ঠিক পাঠ্য পুস্তকের সগোত্র নয়। যদিও বিশেষ করে শিক্ষকদের জন্যই বইখানা লেখা হয়েছে কিন্তু সাধারণ পাঠকও পড়ে উপকৃত হবেন।

বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে প্রাথমিক শিক্ষার কুব্যবস্থায় অন্য কোনো সভ্যদেশ বাংলাদেশের সমকক্ষ হতে পারে না। কিছুদিন থেকে কোনো কোনো জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক হয়েছে—কিন্তু যাঁরা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং বিশেষ করে যাঁরা পাঠ পরিচালনা করেন তাঁরা যে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বা শিক্ষা-কৌশল সম্বন্ধে অবহিত আছেন বিশ্বাস করা কঠিন। আমি বিশ্বাস করি যে তাঁরা যদি বইখানা যত্ন করে পড়েন ও কাজে লাগান তাহলে প্রাথমিক শিক্ষার অনেক উন্নতি হতে পারে।

ভালো ভালো বিদেশী বইয়ে অধ্যাপনা কৌশল, মনস্তত্ব, শিক্ষার গতি ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তার সরস চুম্বক এই বইয়ে আছে। বনিয়াদী শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে

আলোচনা আছে, আর রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের যুদ্ধোত্তর শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার সম্বন্ধে কিছু খবর। শিক্ষা সম্বন্ধে, বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করা প্রত্যেক জাতীয়তাবাদীর অবশ্য কর্তব্য। এই বইখানা তাঁদের পাঠ করতে অনুরোধ করি। শিক্ষকদের বইখানা যে খুব কাজে লাগবে এ সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ইতি

প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা ৩রা মাঘ, ১৩৫১।

অপূর্ব কুমার চন্দ

শিশুশিক্ষার প্রতি স্বাভাবিক ঔৎসুক্যবশতঃ আমাদের দেশের শিশুশিক্ষার বর্তমান দুরবস্থার কারণ অনুসন্ধানে ইচ্ছা জন্মে। আলোচনা করিতে যাইয়া দেখি গোড়ায় গলদ। সেই তুলনায় বিদেশের অবস্থা জানিতে প্রয়াসী হইয়া তাহাদের কথাও কিছু জানিয়া লই। সকল অবস্থা দেখিয়া অনেক কথাই মনে হইয়াছিল। তাহারই কিছু আমার এই বইটিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বিদ্বজ্জন ইহার উপযুক্ততা বিবেচনা করিবেন। মনে হয় আমাদের সমস্যা যেমন গুরুতর, আমাদের জনসাধারণের কাছে তাহা তেমনই অনুপস্থিত। বাংলা ভাষার সাহায্যে জনসাধারণ এ সম্বন্ধে সমাধান পাওয়া দূরে থাকুক, খবরও তাহার কাছে কেহ পৌঁছায় না। সেই সকল দিকে বিবেচনা করিয়া আমার এই বইর প্রয়োজন হয়তো আছে। আমার এই সামান্য প্রয়াস যদি জনসাধারণের ও সুধিবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করে করে এবং জনসাধারণ যদি আমাদের সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হয় এবং সুধিবৃন্দ যদি আমার বক্তব্য সংশোধন করিয়া দিতে উদ্যত হন, তবে আমার এ পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

যে সকল পুস্তকাদি হইতে সাহায্য পাইয়াছি, তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছি। আর যে সকল ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে আমায় নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আজ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিতেছি।

রেণু মিত্র

সূচীপত্র

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস

ভারতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে এবং খ্রীঃ পূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত সময়ে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার কোন সঠিক খবর পাওয়া দুঃসাধ্য। অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে আজ আমরা যাহা বুঝি, সেই প্রাচীনকালে তেমন বুঝাইত না, তেমন শিক্ষার প্রয়োজনও ছিল না। আর্যগণ বেদ প্রণয়ণ করিয়াছিলেন, আর্যশিশুগণ বেদ পাঠ করিত। বৈদিকযুগে—(খ্রীঃ ২৫০০—২০০০) আর্যগণ লিখিবার পদ্ধতি জানিতেন না। পরবর্তী সংহিতার যুগে (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৬০০—১২০০) যে তাঁহারা লিখিবার পদ্ধতি জানিতেন, ইহার প্রমাণ দেশের বিভিন্ন কৃষ্টিতে পাওয়া যায়। মনে হয় আর্যগণ যখন ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা লিখিবার পদ্ধতি জানিতেন না; এদেশের সিন্ধুদেশীয় লোকেদের নিকট হইতে তাহা লিখিয়া লইয়াছিলেন। কেননা লিখনপদ্ধতি যে সিন্ধুদেশীয়দের অনেকদিন পূর্বেই জানা ছিল, সেকথা সিন্ধুদেশের আবিষ্কারে প্রমাণিত হইয়াছে। যাহা-হউক বৈদিক ও ব্রাহ্মণযুগে (খ্রীঃ পূঃ প্রায় ৮০০ পর্যন্ত সময়ে) বেদ পঠন ও পৌরাণিক কাহিনীমাত্র শিক্ষার অঙ্গ ছিল। মনে রাখিতে হইবে যে বেদ শুনিয়া শেখা হইত। আর্যগণ দীর্ঘকাল

পর্যন্ত বেদ লিখিতেন না। বংশপরম্পরায় উহা মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছিল। তাই লেখা যখন আর্যগণ বেশ ভালভাবেই জানিতেন এবং অন্যান্য ব্যাপারেও যখন লিখনপন্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল, তখন পর্যন্ত বেদ লিখিবার প্রচলন ছিল না; আরও পরবর্তীকালে উহা প্রচলিত হইয়াছিল। প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যদি শিশুর আট নয় বৎসর বয়সের পূর্বের শিক্ষাটা বুঝায় তবে ধ্বনি, ছন্দ ও কিছুটা ব্যাকরণই সেই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা ছিল। বেদপঠন ব্রাহ্মণ সন্তানদের অপরিহার্য ছিল; এবং নির্ভুল বেদোচ্চারণ একান্তভাবে লক্ষ্য ছিল। তাই বেদপঠনের প্রাথমিক শিক্ষাটুকু এই সময়ে দেওয়া হইত। কিন্তু এই শিক্ষা শুধু ব্রাহ্মণেরা পাইত। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের যেহেতু বেদে উৎকর্ষ লাভের প্রশ্ন ছিল না, তাই তাহারা প্রার্থনার জন্য কয়েকটি বেদ মন্ত্র শিখিয়া নিজেদের ব্যবসায়ে যোগ দিত। কিন্তু ক্রমে উপনয়ন প্রাপ্ত হইয়া যাহারা দ্বিজত্ব লাভ করিত, তাহারা সকলেই এই শিক্ষার অধিকারী হইত। খ্রীঃ পূঃ প্রায় ৮০০এর সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের উপনয়ন হইতে থাকে। খ্রীঃ পূঃ ৮০০ হইতে ২০০ পর্যন্ত সময়ে এই দ্বিজ সম্প্রদায়ের শতকরা ৭৫ জন লোক শিক্ষিত ছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদের রাজা অশ্বপতি বলিতেছেন যে তাঁহার রাজ্যে কেহ অশিক্ষিত ছিল না। কিন্তু দ্বিজ সম্প্রদায়ই তো দেশের সবটুকু নয়। শূদ্রদের দ্বিজত্ব ছিল না এবং যাহারা অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হইত, যাহারা আর্যদের সঙ্গে মিশিয়া যাইয়া উচ্চবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তেমন অনার্যদের জন্য কোনরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা অশোকের পূর্ব পর্যন্ত দেশে ছিল

বলিয়া কোন নজীর পাওয়া যায় না। দেশের মধ্যে কিংবা অপর দেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য বলিতে যাহা ছিল, তাহা আজকাল-কারদিনের ব্যবসা বাণিজ্যের মত ছিল না বটে, তবু কিছু না কিছু তো ছিল। একেবারে খ্রীঃ পূঃ ২৫০০—২০০০এর মত সময়ে যাহা ছিল, সে অবস্থা হইতে ব্যবসা বাণিজ্য ক্রমে জমিয়া আসিতেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব দেশের যে সম্প্রদায় বেদে উৎকর্ষ লাভ করিত না বা ন্যায় দর্শন পড়িত না এবং যখন লিখিবার পদ্ধতি দেশে ছিল তখন সেই সম্প্রদায় তাহাদের দৈনন্দিন জীবন চালাইবার জন্য ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত পরিমাপ ওজন, আয় ব্যয়ের হিসাব, বিভিন্নদেশের লোকের ভাষা, বাণিজ্য দ্রব্যাদির সংরক্ষণের উপায় ও বিকিকিনির নিয়মাবলী ইত্যাদি নিশ্চয়ই আয়ত্ত করিত এবং ইহার একটা উপায় বা পদ্ধতি কোন না কোন-রূপে নিশ্চয়ই দেশে ছিল বলিয়া অনুমান করিলে বোধ হয় খুব অসঙ্গত হয় না। কিন্তু স্মৃতিকারগণের কারবার ছিল সংস্কৃত ও শাস্ত্র লইয়া, তাই এই সকল বিষয় তাঁহারা লিখিয়া যান নাই। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩০০ শতকের সময়ে বৈশ্যগণ তাহাদের আর্যত্ব হারাইয়া ফেলে।

এই সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা কিভাবে দেওয়া হইত, তাহা বিশেষ জানা যায় না। একটি জাতকে দেখা যায় এক শ্রেষ্ঠী পুত্র অক্ষর পরিচয়ের জন্য কাঠের শ্লেট লইয়া ভৃত্য সমভিব্যাহারে যাইতেছে। তখন প্রাথমিক শিক্ষার ভার কাহার উপর ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। বোধ হয় যাঁহারা পরে বেদ শিক্ষা

দিতেন, তাঁহারাই প্রাথমিক শিক্ষার ভারও লইয়াছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা-দানের কোন সাধারণ কেন্দ্র ছিল না ; তবে অনেকেই যে এই শিক্ষাদান কার্যে যুক্ত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা শিক্ষার খুব প্রসারই তো তখন ছিল। বৌদ্ধধর্মের আগমনে ব্রাহ্মণ্যধর্মের উপর যে চাপ পড়িল, তাহাতে বর্ণবিচারের কঠোরতা অনেকাংশে ভাঙ্গিয়া গেল। এতদিন পর্যন্ত পাঠশালার শিক্ষক ও ছাত্রেরা ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু এখন হইতে তাহার ব্যতিক্রম হইতে আরম্ভ হইল।

অশোক অনেক বৌদ্ধমঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন সেই সময় এই মঠগুলি প্রাথমিক শিক্ষাকাযে কতটা সাহায্য করিয়াছিল, তাহা সঠিক জানা বা বুঝা যায় না। অশোক যে রাজকীয় নির্দেশ বা ধর্মসংক্রান্ত উপদেশ পর্বত গাত্রে বা শিলা সমূহে তত্তৎদেশীয় ভাষায় লিখিয়া রাখিতেন, অনেকের মতে ইহাই স্পষ্ট প্রমাণ করে যে জনসাধারণ শিক্ষিত ছিল। আবার অনেকে বলেন যে শিক্ষিত থাকার ইহাই একমাত্র প্রমাণ নয়। তখন দেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে উপনয়নের ব্যবস্থাও ছিল, এই দুই কারণই প্রমাণ করে যে খ্রীঃ পূঃ ৮০০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ২০০তে শতকরা ৭৫ জন লোক শিক্ষিত ছিল। ঠিক অশোকের সময় বৌদ্ধ মঠগুলি কতটা সাহায্য করিয়াছিল, তাহা সঠিক না জানা গেলেও এই বৌদ্ধ মঠগুলি যে পরবর্তীকালে দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক সাহায্য করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শিক্ষা-কার্যেও তাহাদের স্থান উল্লেখযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি

কাহারও কাহারও মতে আজিকার ভারতবর্ষের যে কোন প্রদেশ হইতে অশোকের সময়েই শিক্ষিত লোকের শতকরা সংখ্যা বেশি ছিল। মহাযান বৌদ্ধমতের প্রসার হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং সেই সময়ে এই মঠ-গুলি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কেবল নয়, জনসাধারণেরও শিক্ষার কেন্দ্র হইয়াছিল, একথা নিশ্চিন্তেই বলা চলিতে পারে। আর উচ্চ-শিক্ষাই যে কেবল সেই কেন্দ্রগুলিতে দেওয়া হইত তাহা নহে, প্রাথমিক শিক্ষাও দেওয়া হইত। ব্রহ্মদেশে আজও বৌদ্ধমঠ-গুলির উপর প্রাথমিক শিক্ষার ভার রহিয়াছে। বৌদ্ধ মঠগুলি শিক্ষাকার্যে আজও কিরূপ সাহায্য করে তাহা ১৯০১ খ্রীঃএর একটা হিসাব দেখিলেই বুঝা যাইবে। ১৯০১ খ্রীঃ আগ্রা ও অযোধ্যাতে প্রতি ১০০০এ ৫৭ জন পুরুষ ও ২ জন নারী শিক্ষিত ছিল। সেই সময়েই বৌদ্ধমঠগুলির কল্যাণে ব্রহ্মদেশে প্রতি ১০০০এ ৩৭৮ জন পুরুষ ও ৪৫ জন নারী শিক্ষিত ছিল। অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৪০ জন শিক্ষিত ছিল; বর্তমান ভারতবর্ষের শতকরা শিক্ষিতের সাড়ে তিন গুণ। ১৯০১ খ্রীঃ বৌদ্ধধর্মের গৌরবময় যুগও নয়। অতএব ইহার গৌরবময় যুগে শিক্ষাকার্যে এই মঠ-গুলির দান খুব বেশি ছিল একথা বলা কষ্ট সাধ্য নহে।

খ্রীঃ পূঃ ২০০ শত হইতে খ্রীষ্টাব্দ ৮০০ শত পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়টাতে দেখা যায় অক্ষর স্বীকরণ বা বিদ্যারম্ভ সংস্কার খুব গৌরব লাভ করিয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায় সেই সময় প্রাথমিক শিক্ষারও খুব উন্নতি হইয়াছিল। পাঁচ ছয় বৎসর বয়স হইতেই শিক্ষা আরম্ভ হইত। এই সময়ের রাজা

রাজকুমারদের শিক্ষাদান প্রণালী হইতে পাওয়া যায় যে ক্ষত্রিয়গণ তাহাদের রাজকার্য পরিচালনানুযায়ী বিষয় সকলের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম, দর্শন, ন্যায়, কাব্য প্রভৃতিও আয়ত্ত করিত। অতি প্রাচীনকালের ইতিহাসেও দেখা যায় গৌতম, রঘু, কুশ, লব পাঁচ বৎসর বয়সে শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে উচ্চ শিক্ষার খুব বিস্তার হইয়াছিল, অতএব প্রাথমিক শিক্ষারও প্রসার হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সপ্তম শতাব্দীতে দেখা যায় ছয় বৎসর বয়সে বালকেরা প্রাথমিক ও যৌগিক অক্ষর শিখিতে আরম্ভ করিয়া ছয় মাসেই উহা শেষ করিয়া ফেলিত। ইহার পরের বৎসর প্রাথমিক অঙ্ক শিখিত। প্রাকৃত ভাষা ক্রমেই মানুষের দৈনন্দিন ভাষা হইয়া উঠিতেছিল। তাই সংস্কৃত শিক্ষার সাথে সাথে প্রাকৃতও শিক্ষণীয় বিষয় হইয়া উঠিতেছিল। প্রাথমিক স্কুলেও প্রাকৃত শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ২২০ হইতে ২৩০ খ্রীঃএ নৃপতি সাতবাহনদের রাজত্ব সময়ে প্রাকৃত রাজকার্যের ভাষা ছিল বলিয়া উহা বিশেষভাবেই প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সময় লিপিশালা বলিয়া অক্ষর শিক্ষার ক্লাশ ছিল এবং দারকাচার্য নামে শিশু-শিক্ষক ছিলেন। ললিত-বিস্তার ও জাতকে কাঠের বোর্ডের কথা পাওয়া যায়। শিক্ষক একটি বর্ণ বোর্ডে লিখিতেন, ছাত্রেরা সশব্দে উহা পড়িয়া যাইত; বর্ণের মত এইভাবে নামতাও শিখিত। পাঠশালার শিক্ষার এই পদ্ধতি বর্তমানকাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে।

এই সময়ে শিশুদের নিয়মানুবর্তিতা খুব বেশি ছিল বলিয়া জানা

যায়। শিশুদের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে খুব চমৎকার কয়েকটি কথা জানা যায়। শিশুদের শাস্তি দেওয়া হইত না। খেলাধূলা খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া হইত। আট বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের দৈহিক ও মানসিক সকল প্রকার উন্নতির জন্য ব্যবস্থা ছিল। এজন্য ধর্ম বা অন্য কোন সংস্কার মানা হইত না।

ধনীর সন্তানদের শিক্ষার ভার যাঁহারা লইতেন, তাঁহারাই গ্রামের অপর ছেলেদের প্রাথমিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেন। কিংবা গ্রামের পুরোহিত, হিসাব রক্ষক, কিংবা বণিক সম্প্রদায়ের কোনও উৎসাহী যুবক হয়তো সে ভার লইত।

ঠিক এই সময়ে শিক্ষিতের সংখ্যা কত ছিল, তাহার কোন নির্দিষ্ট নজীর নাই। এই সময়ে উচ্চ শিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতির ভিত্তি পত্তন হইয়াছিল; ইহাতে মনে হয় যে প্রাথমিক শিক্ষারও প্রসার হইয়াছিল। আবার এই সময়েই ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের কোন কোন অংশ উপনয়নের অধিকার হারাইয়া ফেলে; অতএব তাহাতে প্রাথমিক শিক্ষার দিকেও ক্ষতি হইয়াছিল। সেই সময় বালক-দের মধ্যে শতকরা ৪০ জন প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিত এরূপ বলা চলে। আজ ইংরেজ শাসনে বালকদের মধ্যে শতকরা ১৫ জনের বেশি শিক্ষিত নয়।

ক্রমে প্রাদেশিক ভাষার সৃষ্টি হইতেছিল, তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হইল। ১১৫৮ খ্রীঃএ তালগুণ্ড নামক স্থানে ক্যানারিজ ভাষা এবং ১২৯০ খ্রীঃএ নসিপুরম্ নামক স্থানে ক্যানারিজ, তেলেগু ও মারাঠি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত বলিয়া জানা গিয়াছে। অন্যান্য স্থানেও এইরূপ

ব্যবস্থা থাকিয়া থাকিবে, এ অনুমান অসঙ্গত নয়। সংস্কৃতের স্থান ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতেছিল। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র বালকেরা প্রাদেশিক ভাষা পড়া, লেখা, অঙ্ক, হিসাব রক্ষণ ও সামান্য সংস্কৃত মুখস্থ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিত।

খ্রীঃ ১২০০ শতকে দেশে হিন্দুরাজত্ব শেষ হইবার সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা জানিবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। তবে এদেশে ইংরেজ শাসনের পূর্বের যে অবস্থা জানা গিয়াছে, তাহার সাহায্যে হিন্দু রাজত্বের-শেষে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা কিছু বলা যায় বটে। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর মুসলমান রাজত্বের ফলে দেশে হিন্দুদের শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কিছু কিছু আরবী পারসী ছাড়া দেশে শিক্ষার আর কোন ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠে নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে সমস্ত রাজকীয় সাহায্য লোপ পাওয়ার ফলে, এবং প্রাচীন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন জন্য, প্রাচীন পাঠশালার অনেকেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। তথাপি ১৯শ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজ সরকার সমস্ত ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে যে হিসাব লইয়াছিলেন তাহাতে দেখা যায় যে ইহার বহুল প্রচারই ছিল। মান্দ্রাজে প্রতি গ্রামে একটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, বাংলার প্রায় প্রতি গ্রামেই লেখাপড়া ও অঙ্ক শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল। মালব দেশ ইংরেজ শাসনে আসিবার পূর্বে ৫০ বৎসর ধরিয়া রাষ্ট্রগত বিশৃঙ্খলায় পিষ্ট হইয়াছে। তথাপি তথায় প্রতি ১০০টি বাড়ী লইয়া এক একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। সরকার যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা যে নির্ভুল, তাহা

মনে করিবার কোন কারণ নাই। অতএব দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ইহা অপেক্ষাও ভাল ছিল বলিলে ভুল অনুমান হয় না। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুযোগ যে দেশের সকলেই পাইত, ঠিক তাহা নয়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বণিক বা বৈশ্য সম্প্রদায়ই এ সুযোগ বিশেষভাবে ভোগ করিত। তবে নিম্ন বর্ণের দুই চারিজন যে একেবারেই পাঠশালায় যাইত না তাহা নহে—বাগ্দি, মুচি, কামার, কুমার, জেলে, মাল, কলু প্রভৃতির সন্তানেরাও অল্প স্বল্প পাঠশালায় যাইত, মেয়েরা বিশেষ যাইত না, খুব অল্প বয়সে দুই একজন যা যাইত, কিন্তু একটু বয়স হইলেই তাহারা সে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইত।

অনেকের মতে যেহেতু শিক্ষা সর্বসাধারণের মধ্যে ছিল না, সুতরাং দেশের শতকরা ১৫ জন লোক শিক্ষিত ছিল বলা যায়। অতএব মুসলমান রাজত্বের শেষে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমেই যদি প্রাথমিক শিক্ষার এরূপ অবস্থা থাকে, তবে হিন্দু রাজত্বের শেষে মুসলমান রাজত্বের প্রথমে শিক্ষার অবস্থা আরও অনেক ভাল ছিল। শতকরা সংখ্যা অন্ততঃ ইহার দ্বিগুণ ছিল বলিলে কিছু ভুল হয় বলিয়া মনে হয় না। দেশে দীর্ঘ দিনের অরাজকতায় যখন শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই প্রায় হয় নাই, তখনও যদি শতকরা ১৫ জন হয়, তবে হিন্দু রাজত্বের অবসানের সময়ে শতকরা সংখ্যা অন্ততঃ ইহার দ্বিগুণ হইবেই, ইহা নিঃসংশয়েই বলা চলে।

ইহার পর আমাদের দেশে আরম্ভ হয় মুসলমান যুগ। পূর্ববর্তী মঠ মন্দির প্রভৃতি যে সমস্ত স্থান শিক্ষার কেন্দ্র ছিল সে

সকলের অনেকগুলিই ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মুসলমান রাজারা কেহ কেহ উচ্চ শিক্ষার জন্য এবং আরবী পারসী শিক্ষার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা করিলেও এক আকবর ব্যতীত আর কেহই হিন্দু জনসাধারণের শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে পারসী যখন রাজ দরবারের ভাষা হইয়া দাঁড়াইল, তখন দেশে মক্তব ও মাদ্রাসা অনেক স্থাপিত হইয়া আরবী পারসীর পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। ওদিকে ধ্বংসের হাত হইতে যাহারা রক্ষা পাইয়াছিল, রাজকীয় সাহায্যের অভাবে ও দেশের সকল ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসায় সেই সকল টোল পাঠশালাও অনেকই উঠিয়া যাইতেছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজেরা এদেশে আসিয়া টোল পাঠশালা মক্তব ও মাদ্রাসা দেখিতে পাইয়াছিল। তৎপর ১৯শ শতকের প্রথমাংশে যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এইখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। আজ আমরা প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝি, তখন এরূপ বুঝাইত না। মাধ্যমিক শিক্ষা বলিয়া কিছু ছিল না। সে যুগের সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং মানুষের প্রয়োজন বোধ যেরূপ ছিল, তাহাতে সে সময়ের স্বল্প প্রাথমিক শিক্ষা ও কিছু লোকের জন্য উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থাতেই দেশের লোকের দিন ভাল ভাবেই কাটিয়া যাইতেছিল। তখন উচ্চ শিক্ষা অবৈতনিক ছিল। পাঠশালার ছাত্রেরা পয়সা বা চাল ডাল যে যাহা পারিত দিত। আজকালকার মত তখন বিজ্ঞান ভূগোল প্রভৃতি প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যভুক্ত ছিল না। ছাত্রেরা পাঠশালায় রামায়ণ মহা-

ভারত পড়িতে, চিঠিপত্র লিখিতে, দলিল প্রভৃতি তৈয়ারী করিতে, এবং হিসাবপত্র রাখিতে শিখিত,—ইহার বেশি তাহাদের প্রয়োজন হইত না। ইংরেজরা আসিয়া দেখিয়াছেন হিন্দু মুসলমান উভয়েই পাঠশালায় যাইত। শিক্ষার জন্য কাহাকেও গ্রামের বাহিরে যাইতে হইত না।

ইহার পর ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব কায়েম হইল। মুসলমান রাজত্বের অবসান, এবং বিভিন্ন জাতির এই দেশ অধিকার প্রচেষ্টার ফলে দেশে যে অরাজকতা দেখা দিয়াছিল, তাহাতে পূর্ববর্তী শিক্ষাব্যবস্থা আরও লোপ পাইল। এদেশে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য ভাবধারা দেশের সকল ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে লাগিল। এই ভাবধারার সঙ্গে পূর্বে আমাদের পরিচয় ছিলনা। সেই সময় ব্যবসা বাণিজ্যে ও বিজ্ঞানে ইংরেজরা সমৃদ্ধশালী জাতি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাহার রাজ্য শাসন ব্যবস্থা চালাইবার জন্য ক্রমে একদল ইংরেজী-জানা এ দেশবাসী লোকের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিল। এদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এ দেশ অধিকারের পর হইতেই ইংরেজ মিশনরীগণ এদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের জন্য যত্নবান হইলেন। তাঁহারা ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ভাষাও শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহারই সমসাময়িককালে এদেশীয় কয়েকজন মহাত্মা বুঝিতে পারিলেন যে ইংরেজী ভাষা ও সেই সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষা না করিলে আমাদের দেশের উন্নতি হইতে পারে না। সেই সময়ে ইংরেজী সাহিত্যের রসও দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। এই সমস্ত নানা কারণে দেশের মধ্যে

একটা বিরাট ভাব-পরিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছিল, তাহাতে পূর্ববর্ত্তী পাঠশালাগুলি একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল বলা চলে। পুরাতন প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সমূলে বিনষ্ট হইল। দেশের বড় বড় শহরে কয়েকটি উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হইল কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা দানা বাঁধিয়া উঠিল না। এইরূপ সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ঠিক কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহার একটা মোটামুটি হিসাব লওয়া যাক।

দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির শিক্ষার চেষ্টায় মনোনিবেশ করিবার সুযোগ হয় নাই। হিন্দু মুসলমানকে ইংরাজী শিখাইয়া চাকুরী দিয়া তুষ্ট রাখিবার জন্য কিছু ব্যবস্থা মাত্র সরকার করিলেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার কথা তখনও কাহারও মনে হয় নাই। ক্রমে কেহ কেহ বুঝিতে পারিলেন যে ভারতবাসীকে যত বেশি শিক্ষা দেওয়া যাইবে, ভারতীয়গণ ততই বৃটিশের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইবে এবং সাম্রাজ্য ততই স্থায়ী হইবে। কিন্তু কোম্পানি ইহা স্বীকার করিতে পারিল না। ইহার কিছুদিন পরে মিশনরীদের প্রচেষ্টায় ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে এ সম্বন্ধে আবার কথা উঠে। কোম্পানির ডিরেক্টরগণ এইবার এই নীতি স্বীকার করিলেন, এবং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি একলক্ষ টাকা প্রাচ্যদেশীয় প্রাচীন ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য এবং ইউরোপীয় শিক্ষা প্রচার করিবার জন্য মঞ্জুর করিলেন। কিন্তু এই সময়ে নানারূপ যুদ্ধের সূচনা দেখা দিল, কাজ বিশেষ হইল না, বিশেষতঃ ডিরেক্টরগণের কাহারও এই দিকে আন্তরিক চেষ্টা

ছিলনা, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। মিশনরীগণ যে যে স্থানে চার্চ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে তাঁহারা ধর্ম সংস্থাপনের ভিত্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেও প্রয়াস পাইতেছিলেন, কিন্তু ইহাছাড়া গ্রামে আর কোন প্রচেষ্টা ছিল না, এবং সমগ্রদেশের প্রয়োজনের তুলনায় মিশনরীদের প্রচেষ্টা নিতান্তই যৎসামান্য। নানা কারণে যে ইংরেজী শিক্ষার চাহিদা ক্রমেই বাড়িতেছিল, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করিলেন, যে কেহ ইংরেজী পড়িতে ও লিখিতে পারিবে, তাহাকে রাজকার্যে নিযুক্ত করা হইবে। ইহাতে একদিকে যেমন ইংরেজী শিক্ষার চাহিদা খুব বাড়িয়া গেল, অন্যদিকে শিক্ষা অর্থকরী হইয়া পড়িল—জ্ঞানের জন্য শিক্ষা রহিল না। কিন্তু তাহাতেও দেশের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু হয় নাই। কয়েকজন লোক শুধু ইংরেজী শিখিয়া চাকুরী পাইতে লাগিল।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার চার্লস্ উডের এডুকেশন ডেসপ্যাচ বাহির হইল, ইহাতে ভারতে শিক্ষার নানারূপ সংস্কারের কথা উল্লিখিত হইল, ইহার উদ্দেশ্য ছিল কেবল উচ্চশ্রেণীর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া দেশের সকল শ্রেণীর লোকের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। ইহাতে প্রতি ছাত্রের বেতন দিবার ব্যবস্থাও করা হইল, শিক্ষকদিগকে ট্রেনিং দিবার জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থা হইল। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা হইল। ভাল ভাল ইংরেজী পুস্তক মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া পাঠ্য করিবার কথাও বলা হইল।

যদিও ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এই বিজ্ঞপ্তিতে প্রাথমিক শিক্ষার একটু আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু আসলে এগুলি ঠিক প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিত হয় নাই। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা সম্বন্ধে যে প্রচেষ্টা ছিল, তাহাকে প্রাথমিক শিক্ষা বলা যায় না, উহা মাধ্যমিক শিক্ষাই বটে। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে যে, কৃষক হইতে সকলেরই শিক্ষিত হওয়া দরকার, তাহা সরকার বুঝিতে পারেন। গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা স্থাপনের জন্য কতকগুলি প্রস্তাব করিয়া বলা হয় যে, জিলা ও মিউনিসিপাল বোর্ডগুলি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকল্পে উপযুক্তরূপ অর্থব্যয় করিবে। এই প্রস্তাবের ফলে দেশে শিক্ষার কিছু প্রসার হয়।

ইহার পর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগত গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে ভারতে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করিবার জন্য কেন্দ্রীয় পরিষদে এক আইন বিধিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন। দুই বৎসর কাল পরিষদ এই বিলটির উপর বিতর্ক করিয়া উহা পরিত্যাগ করে। বিলটি পরিত্যক্ত হইলেও গভর্ণমেণ্ট আশ্বাস দেন যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইবে, এবং ক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈ-তনিক করা হইবে।

১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষে আসেন। দিল্লীর দরবারে তিনি ঘোষণা করেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল হইতে শিক্ষার জন্য প্রতিবৎসর ৫০ হাজার টাকা খরচ করা

হইবে। ইহার এক বৎসর পর গভর্ণমেন্ট শিক্ষানীতি পরিবর্তন করিয়া এইরূপ করেন—(১) নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুব বাড়াইতে হইবে, (২) স্থানে স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করিতে হইবে। এই প্রাথমিক স্কুলগুলি বোর্ডস্কুল নামে অভিহিত হইবে। (৩) প্রয়োজন হইলে বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপনের উৎসাহ দিতে হইবে। (৪) গ্রাম ও শহরের পাঠ্যসূচী একই হইবে। (৫) শিক্ষকগণ অন্ততঃপক্ষে মধ্যবাংলা পাশ থাকিবেন। তাহাদের উপযুক্ত ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করিতে হইবে। ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বেতন মাসিক ১২৲ টাকার কম হওয়া অনুচিত। একজন শিক্ষক ৫০ জনের বেশি শিশুকে পড়াইতে পারিবেন না। (৬) মধ্যবাংলা বিদ্যালয়সমূহ বাড়াইতে হইবে। (৭) বিদ্যালয়-গৃহ স্বাস্থ্যসম্মতস্থানে নির্মাণ করিতে হইবে।

এই নীতির অবলম্বনে বাংলাদেশের অনেক বেসরকারী স্কুল বোর্ডস্কুলে পরিণত হইল। "পঞ্চায়েতী ইউনিয়ন স্কীম" অনুসারে প্রতি ইউনিয়নে সরকারী খরচে একটি করিয়া মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে সরকার সিদ্ধান্ত করেন। এই নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার ভার জিলা বোর্ডের হাতে দেওয়া হইল। কিন্তু নানা কারণে এই মডেলস্কুল-স্কীমও বেশি দিন টেকে নাই।

বর্তমান অবস্থা ঃ—১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন অনুসারে মিউনিসিপালিটি

ইচ্ছা করিলে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারে। করা না করা মিউনিসিপালিটির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। মিউনিসিপালিটি অর্ধেক খরচ বহন করিলে বাকি অর্ধেক বাংলা সরকার নিতে প্রস্তুত থাকিবেন। এই আইনের ফলে বাংলাদেশের ১১৮টি মিউনিসিপালিটির মধ্যে মাত্র ৩৪টি মিউনিসিপালিটিতে অবৈতনিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়।

১৯২১এ ইহার আরও একটু সংস্কার হয়। স্থির হয় গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ড ও জিলা বোর্ড যদি অর্ধেক খরচ বহন করে তবে গ্রামেও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা স্থাপনের জন্য সরকার বাকি অর্ধেক খরচ বহন করিবেন। কিন্তু এই সকল বিধানে কাজ খুব সন্তোষজনক হইল না।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত মিঃ ইভান বিস্ বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনা দিতে যাইয়া বলেন যে বাংলাদেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা পিছনে রহিয়াছে। তিনি নানারকম তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেখান যে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দুই কোটি টাকা recurring এবং দুই কোটি টাকা non-recurring খরচ হইবে। মিঃ বিসের পরিকল্পনা যতটুকু কার্যকরী হইয়াছিল তাহার ফলে প্রতিবৎসর প্রায় ৬০ হাজার বিদ্যালয়ে ২০ লক্ষ ছাত্র পড়িতে আরম্ভ করে।

উপরের সংখ্যা সংখ্যা-হিসাবে যতটুকুও উৎসাহব্যঞ্জক, আসল লাভের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় অত্যন্ত অল্প সংখ্যক ছাত্রই এক বৎসরের বেশি বিদ্যালয়ে থাকে। সর্বনিম্ন শ্রেণীতে ছাত্র সংখ্যা অসম্ভব রকম বেশি থাকিত। শিশুশ্রেণীর ১০০ জন

শিশুর মধ্যে মোট ৩০ জন প্রথম শ্রেণীতে, ২০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে, ৫ জন তৃতীয় শ্রেণীতে এবং ৩ জন চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইত। এই অবস্থা দূর করিবার উপায় চিন্তা করিয়া অভিজ্ঞগণ বলিলেন যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সহিত উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করিলেই শুধু এই দোষ নিবারিত হইতে পারে।

এই সকল কারণে ১৯৩০ খ্রীঃ এ প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত আর এক আইন পাশ হয়। আইনে বলা হয় বাংলার প্রতি জেলায় একটি করিয়া জেলা স্কুল বোর্ড গঠিত হইবে। এইখানে উল্লেখ করা যায় যে আজ পর্যন্ত কলিকাতা বাদে বাংলার ২৭টি জেলার মধ্যে নিম্নলিখিত মাত্র ১৭টিতে জেলা স্কুল বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। যথা—(১) ময়মনসিংহ, (২) ঢাকা, (৩) চট্টগ্রাম, (৪) নোয়াখালি, (৫) পাবনা, (৬) বগুড়া, (৭) রংপুর, (৮) দিনাজপুর, (৯) জলপাইগুড়ি, (১০) নদীয়া, (১১) মুর্শিদাবাদ, (১২) বীরভূম, (১৩) ত্রিপুরা, (১৪) ফরিদপুর, (১৫) হাওড়া, (১৬) ২৪ পরগণা, (১৭) বাখরগঞ্জ। সরকারের শিক্ষাদান প্রচেষ্টার দ্রুতগতি লক্ষণীয়! যাহা হউক—স্থির হয় এই বোর্ড গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত করিবেন, প্রজা ও জমিদারের নিকট হইতে নির্দিষ্টহারে শিক্ষাকর আদায় করা হইবে, ব্যবসায়ীগণও একপ্রকার শিক্ষাকর দিবেন। শিক্ষার্থীর বয়স ৬-১০ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। চারি বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হইবে। বর্ত্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও গ্রামবাসিদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে কিন্তু ভবিষ্যতে বাধ্যতামূলক করাই

ইহার উদ্দেশ্য রহিল। মেয়েদের জন্য কোন পৃথক বিদ্যালয় স্কুলবোর্ড স্থাপন করিল না। বালিকারা ইচ্ছা করিলে বালকদের স্কুলে পড়িতে পারিবে বলিয়া নির্দেশ রহিল।

কিন্তু আইন পাশ করিলেই সমস্ত দায়িত্বের শেষ হয় না: এই আইন কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত বাঙ্গালা দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেল।

অতএব প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার করিয়া ব্যাপকভাবে উহা আরম্ভ করিবার জন্য এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সনে বাঙ্গালা সরকার এক প্রস্তাব প্রকাশ করেন। এই প্রস্তাব অনুসারে সর্বপ্রথম ময়মনসিংহ জেলাতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করা হয়। চারিটি শ্রেণীকে দুইভাগে ভাগ করিয়া দুই সময়ে পড়াইবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম শ্রেণী সকাল ১০টা হইতে ১২½টা পর্যন্ত এবং অন্য শ্রেণীগুলি বেলা ১টা হইতে ৪½টা পর্যন্ত পড়ান হয়। ইহাতে স্থান ও শিক্ষকের সমস্যা সমাধান করা হয়। নূতন যে সমস্ত শিক্ষক এই প্রাইমারী স্কুল-গুলিতে নিযুক্ত করা হইল, তাহারা সকলেই ম্যাট্রিক পাশ। আর যে সমস্ত নন-ম্যাট্রিক আনট্রেণ্ড (untrained) শিক্ষক পূর্ব হইতেই প্রাইমারী বিদ্যালয়গুলিতে কাজ করিত, তাহাদের একটা নির্বাচনী পরীক্ষা লওয়া হইল। উপযুক্ত নম্বর পাইয়া যাহারা পাশ করিল, তাহাদিগকে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করা হইল।

১৯৩৮ সনের ৩রা জানুয়ারীতে ময়মনসিংহ জেলায়

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। সেই বৎসর অন্য কোন জেলায় আর এই জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় না। ক্রমে ক্রমে এই অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বাঙ্গালাদেশের অন্যান্য অনেক জেলাতে প্রবর্তন করা হইতেছে। অধুনা যে সমস্ত জেলাগুলিতে স্কুলবোর্ড রহিয়াছে, সেই সমস্ত জেলাতেই অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন হইয়াছে।

সমস্ত বাঙ্গালাদেশে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করা হইলে, কি প্রকার ব্যয় হওয়া সম্ভব তাহার একটা হিসাব ধরা যাইতে পারে। সমস্ত বাঙ্গালাদেশের ৬-১০ বৎসরের শিশুর সংখ্যা ৬০ লক্ষের উপর হইবে এবং প্রতি ৩০ জন শিশুর জন্য যদি একজন করিয়া শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, তবে মোট ২ লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন। স্কুল বোর্ড কর্তৃক নিধারিত বেতন যদি সমস্ত শিক্ষককে দেওয়া যায় এবং স্কুলের অন্যান্য খরচ যদি স্কুলবোর্ড বহন করে তাহা হইলে বাৎসরিক ৪ কোটি টাকার প্রয়োজন হয়। অথচ সমগ্র বাঙ্গালাদেশে যদি শিক্ষাকর বসান হয়, তবে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষের মত টাকা আদায় হইবে; উপরন্তু যদি ইহার উপর বাঙ্গালা সরকার কিছু সাহায্য করেন, তবে মোট ২ কোটি বা ২½ কোটি টাকার বেশি সংস্থান হয় না। অতএব বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ভবিষ্যত যে বাঙ্গালাদেশে ঘোর তমসাচ্ছন্ন, সে কথা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বাঙ্গালাদেশের কতগুলি জেলাতে আরম্ভ হইল, কিন্তু ইহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে, বহু চিন্তা ও গবেষণার প্রয়োজন। বাঙ্গালা সরকার সেইজন্য একটি

প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির রিপোর্ট ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বাহির হয়। এই কমিটি বলেন যে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের প্রাইমারী শিক্ষা আইন অনুযায়ী সমস্ত বাঙ্গালাদেশে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে, মিউনিসিপালিটিগুলিতেও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকদিগের বেতন ২০৲ হইতে ২৫৲ টাকা পর্যন্ত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার যুগে প্রত্যেক নব-নিযুক্ত শিক্ষক ম্যাট্রিক এবং ট্রেনিং প্রাপ্ত হইবেন। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক উপযুক্ত দক্ষতা দেখাইতে পারিলে প্রাথমিক স্কুলের ইন্‌স্‌পেক্টর হইতে পারিবেন। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদিগকে পল্লীউন্নয়ন সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হইবে। যথাসম্ভব শীঘ্র প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ট্রেণ্ড ম্যাট্রিকের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

কমিটির উপরি উক্ত সুপারিশ ছাড়াও ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ তারিখে প্রাথমিক শিক্ষার কতকগুলি সরকারী নিয়মাবলী বাহির হইয়াছে। এই নিয়মাবলী অনুসারে স্কুলবোর্ড যথারীতি প্রাইমারী স্কুলের স্থান ও অবস্থান জরীপ করিবে। ৩.১৪ বর্গ-মাইলের মধ্যে অথবা ২০০০ লোকসংখ্যা যেখানে আছে, এইরূপ স্থানে স্কুল স্থাপিত হইবে। প্রাইমারী স্কুলের অবস্থিতির ও স্থানান্তরের ব্যবস্থা জেলাস্কুল ইন্‌স্‌পেক্টরের অভিমত লইয়া করিতে হইবে। জেলাস্কুল ইন্‌স্‌পেক্টরের অভিমত ছাড়া স্কুলবোর্ড কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিবে না। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বালিকাগণকে বালকগণের সহিত পড়িতে বাধ্য করা হইবে না। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার

উপর শিক্ষকের সংখ্যা নির্ভর করিবে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৩৫ এর উপর হইলে প্রতি ৪০ জন বা তাহার কোন অংশের জন্য একজন করিয়া অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে। ১৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য তিনজন শিক্ষক থাকিবে। অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইলে জেলাস্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টরের অভিমত বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। কোন আনট্রেণ্ড (untrained) শিক্ষক স্কুলে নিযুক্ত হইলে, তাঁহার ট্রেণিং না হওয়া পর্যন্ত তিনি চাকুরীতে পাকা হইবেন না। কোন শিক্ষককে ট্রেণিংএ যাইতে বলা হইলে যদি তিনি না যান তবে তাঁহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইবে। জেলা-স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টরের রিপোর্ট বিবেচনা না করিয়া কোন শিক্ষককে পদচ্যুত করা যাইবে না। পদচ্যুত শিক্ষকের, শিক্ষাবিভাগের ডিরেকটার বাহাদুর পর্যন্ত, পদচ্যুতির আদেশের ৬০ দিনের মধ্যে আপীল করিবার ক্ষমতা রহিল।

এইখানে একটি সুখবর আছে। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহ জেলার কুলিয়ারচর ইউনিয়নে পরীক্ষামূলক ভাবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই ইউনিয়নে সাতটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এই ইউনিয়নে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিবার উদ্দেশ্যে এই স্থানের লোকসংখ্যা আবার গণনা করা হয়। গণনায় ৬-১০ বৎসরের ছাত্রের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১০২৪। স্থানীয় উৎসাহী ব্যক্তিগণের সাহায্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন-কারীরা সকলের বাড়ী বাড়ী যাইয়া সকলকে ছেলে বিদ্যালয়ে

পাঠাইতে রাজী করিয়াছেন। শিক্ষাগ্রহণে কেবল ছেলেদেরই বাধ্য করা হইয়াছে ; বলা হইয়াছে ছেলেদের মধ্যে কাজের সফলতা দেখিয়া মেয়েদের ব্যবস্থা পরে করা হইবে। এই কয় মাসে সেখানকার কাজ বেশ সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে। দেখা গিয়াছে যে শতকরা ৮৫ জন ছাত্র বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকিতেছে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসে এই খবরটি আনন্দজনক সন্দেহ নাই; আমরা ইহার প্রসার দেখিবার অপেক্ষায় রহিলাম।

প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাসে ওয়ার্ধা পরিকল্পনা ও সার্জেণ্ট কমিটির রিপোর্টের কথা উল্লেখ না করিলে এই ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। উহাদিগকে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছি ; বইয়ের শেষে উহাদের পৃথক আলোচনা করিব।

১৯৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১১,৪৪৫,৩৯২। সেই সময় বাঙ্গালাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫৪,৪৬০। ১৯৪০-৪১ ঐ সংখ্যা ছিল ৫১,৪৪০। ইহার পরে শিক্ষাবিভাগের কোন ছাপান রিপোর্ট আজও বাহির হয় নাই। আমরা মোটামুটিভাবে ধরিতে পারি বর্ত্তমানে ঐরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫২,০০০ হইবে। ১৯৩৯-৪০এ বাঙ্গালাদেশে কেবল প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২,২৬৫,৯২৮ এবং উহা ১৯৪০-৪১এ ছিল ২,৪৩৫,১৪৯। এই সংখ্যাগুলির মধ্যে উচ্চ বা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত প্রথম চারি শ্রেণীর ছাত্র এবং ছাত্রীদের ধরা হয় নাই। প্রাথমিক ছাত্রদের মোটসংখ্যা আপাতদৃষ্টিতে ভাল মনে হইলেও,

এই সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য এই যে প্রথম শ্রেণীতেই খুব বেশি সংখ্যক ছাত্র ভর্তি হয় কিন্তু তাহাদের মধ্যে শতকরা ৭।৮ জন মাত্র চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত হয়। বাংলা দেশের প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র সংখ্যার শতকরা হিসাব দুই বৎসরের এইরূপ ঃ—

১৯৩৯-৪০			১৯৪০-৪১		
প্রথম শ্রেণী—শতকরা		৬৭'০	প্রথম শ্রেণী—শতকরা		৬১'৮
দ্বিতীয় শ্রেণী—	,,	১৬'৩	দ্বিতীয় শ্রেণী—	,,	১৯'৪
তৃতীয় শ্রেণী—	,,	৯'৬	তৃতীয় শ্রেণী—	,,	১১'০
চতুর্থ শ্রেণী—	,,	৭'১	চতুর্থ শ্রেণী—	,,	৭'৮

প্রথম শ্রেণীতে যাহারা ভর্তি হইল, দ্বিতীয় শ্রেণীতে তাহাদের এক চতুর্থাংশ রহিল বলা চলে ; দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্ধেকের কিছু বেশি তৃতীয় শ্রেণীতে ; এবং তৃতীয় শ্রেণীর তিন ভাগের দুইভাগ চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নীত হইল বলা চলে। চতুর্থ শ্রেণীর সকলেই যে আবার শেষ পরীক্ষায় পাশ করে তাহা নহে, অনেকে পরীক্ষাও দেয় না। ১৯৪০ সনে চতুর্থ শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৬১,৯২০ এবং ১৯৪১ সনে ঐ শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৯০,৬৯১। কিন্তু পরীক্ষা দিবার সময় ১৯৪০ এবং ১৯৪১ সনে যথাক্রমে ৫৭,৯৯৭ এবং ৭১,৬৪৬ পরীক্ষা দিয়াছিল ; অতএব কতটা অপচয় যে হয় তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহা ব্যতীত যাহারা পরীক্ষা দেয়, তাহারা সকলে পাশও করিতে পারে না। প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় পাশের সংখ্যা অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক। বাঙ্গালাদেশে ১৯৩৯-৪০ খ্রীঃএ প্রাইমারী শেষ পরীক্ষার্থিগণের মধ্যে শতকরা

৭৯% এবং ১৯৪০-৪১ শতকরা ৭৬% পাশ করিয়াছিল। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা এই। এতসব করার পর ১৯৪১ এর গণনায় দেখা গিয়াছে এদেশে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা শতকরা ১১ জন মাত্র। অতএব শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা যে কী তিমিরে আছি, তাহা বোঝা কষ্টসাধ্য নহে। শিশু-শিক্ষার মত একটি মৌলিক সমস্যার সীমাহীন অন্ধকারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাদের কর্তব্য কি?

এক কথায় বলিতে গেলে সমস্ত ব্যবস্থাটার আমূল পরিবর্তন দরকার। আমরা দেখিয়াছি প্রথম কিংবা দ্বিতীয় বৎসরেই বেশির ভাগ ছাত্রের পাঠ সমাপ্ত হয়। আমরা কি করিতে পারি? মহাত্মা গান্ধীর ওয়ার্ধা পরিকল্পনা আমাদের বহু সমস্যার সমাধান করিতে পারিত। কিন্তু তাহা অচল হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। উহার পরিবর্তে আজ কি করা যায়? বর্তমান প্রচলিত ব্যবস্থা শত ছিদ্রপূর্ণ। ইহার পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন আবশ্যক, শিক্ষকদের যোগ্যতা ও বেতন বাড়ান প্রয়োজন, ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা প্রয়োজন, শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসিবার পূর্বের অবস্থার জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রয়োজন এবং সর্বোপরি পাঠদান পদ্ধতির পরিবর্তন আবশ্যক। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের সমস্যার অন্ত নাই। আমরা আমাদের সুপ্রাচীন ব্যবস্থা হারাইয়াছি, বর্তমান পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যাহা আছে তাহারও সবটুকু পাই নাই, কেবল বাহিরের একটা লোক দেখানো সহানুভূতিহীন রূপ সমস্ত দেশটার অশিক্ষার অন্ধকারকে ব্যঙ্গ করিতেছে মাত্র।

প্রাথমিক শিক্ষা ও গ্রাম

আজ আমাদের গ্রামগুলিতে শিক্ষা বিস্তারের অন্তরায় প্রচুর। প্রথমেই চোখে পরে সমস্ত দেশময় সীমাহীন দারিদ্র্য। যুদ্ধের সময়কার একেবারে বর্তমানকে বাদ দিয়াও শুধু কোনও রকমে কিঞ্চিৎ আহারে দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতেছে কিংবা প্রতিমুহূর্তেই মনে করিতেছে আর বুঝি পারা গেল না—এমন লোকের সংখ্যা দেশে কোনওদিনই কমতি ছিল না। এই সকল পরিবারের পাঁচ ছয় বৎসরের বালককেও আহার সংস্থানের কাজে বিশেষ সাহায্য করিতে হয়। ইহারা বিদ্যালয়ে গেলে অভিভাবকদের নানাভাবেই কষ্ট হইয়া থাকে। অতএব শিক্ষা ব্যাহত হয়।

ইহার পর সমস্ত দেশে নানা রোগের বিশেষতঃ ম্যালেরিয়ার জাল পাতা। দেহ রক্ষার উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে যাহারা এমনিতেই জীর্ণশীর্ণ, তাহারা যদি কয়েকদিন পরে পরেই জ্বরে আক্রান্ত হয়, তবে পড়াশুনা করিবার জন্য তাহাদের দেহে মনে কী শক্তি অবশিষ্ট থাকিতে পারে? তাহারা নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসিবেই বা কী করিয়া? অতএব শিক্ষা ব্যাহত হয়।

বিরাট ভারতবর্ষের ৭০,০০,০০০ লক্ষ গ্রামের মধ্যে প্রতি গ্রামে ৫০০ জনেরও কম লোকের বাস, এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাতায়াতেরও কোন সুগম পন্থা নাই। এইজন্য মাঝে মাঝে বিদ্যালয় স্থাপন করা হইলেও দূরত্ব রহিয়াই যায়। এই দূরত্ব

শিক্ষার বিশেষ বাধা হইয়া দাঁড়ায়। বিশেষতঃ সাধারণতঃ দুই একজন মাত্র স্বল্প শিক্ষিত, স্বল্প বেতন প্রাপ্ত শিক্ষকের বিদ্যালয়গুলিতে আকৃষ্ট হইবার মত কিছুই প্রায় পায় না বলিয়া বিশেষ কষ্ট করিয়া দীর্ঘদিন ধরিয়া বিদ্যালয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীর পক্ষে ঘটিয়া উঠে না। এই দূরত্বের সঙ্গে রহিয়াছে বাঙ্গালাদেশের কাল বৈশাখীর ঝড় ও শ্রাবণের অবিরাম জলধারার বাধা। বৎসরের অন্য সময়ে যে রাস্তায় সহজেই হাঁটিয়া যাওয়া চলে, বর্ষাকালে সে স্থান জলকাদায় এমন দুর্গম হইয়া পড়ে যে যাতায়াত বন্ধ করিতেই হয়; কিংবা যে ক্ষুদ্র নদী অন্য সময়ে হাঁটিয়া বা সহজেই পার হওয়া চলে, বর্ষাকালে সেই নদীরই দুই দিক এত ভাসিয়া যায় যে প্রত্যহ বিদ্যালয়ে হাজিরা দেওয়া সম্ভব হয় না। এদিকে ঝড় ও জল সহ্য করিবার মত গ্রামের বিদ্যালয় গৃহগুলি শক্তও নহে। সকল গ্রামে বিদ্যালয়ের জন্য পৃথক গৃহও নাই, অমুকের চণ্ডীমণ্ডপে বা একচালার নীচে অথবা গৃহের বারান্দায় ক্লাশ হয় এমন দৃষ্টান্তও স্বল্প নহে। অতএব এসব কারণেও শিক্ষা ব্যাহত হয়। ইহার উপর সামাজিক সংস্কার, পর্দাব্যবহার রীতি, অল্পবয়সে বিবাহ ইত্যাদিও আমাদের বাল্য শিক্ষাকে ব্যাহত করে।

কিন্তু এই সকলই বাহিরের অন্তরায়। পৃথিবীর অপর সকল দেশেই প্রাকৃতিক ও সামাজিক সকল প্রকার সুবিধা পূর্ব হইতেই থাকে না, তাই বলিয়া কোন দেশেই আজ শিক্ষা বন্ধ হইয়া যায় নাই; কিংবা একটা অচল অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। আমাদের দেশের শিক্ষার এই দৈন্যের ভিতরের

কথাটি হইতেছে এই যে আমরা আমাদের শিক্ষাকে জীবনের ভিতর হইতে দেখি নাই এবং বর্তমান সমস্ত ব্যবস্থাটা সহানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। মানুষের জীবনের সকল উন্মুখতাকে বিকাশ করাতে এবং তাহার জাতীয় জীবনের ভাব ও কর্মের মধ্যে উহাকে ফুটাইয়া তোলাতেই শিক্ষার প্রয়োজন ও সার্থকতা। কিন্তু আজ প্রাথমিক শিক্ষা হইতে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রেই যে শিক্ষা-ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা একেবারেই আমাদের পক্ষে প্রকৃত শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও আদর্শ অনুযায়ী প্রস্তুত হয় নাই। ইহা যেমন আমাদের আবেষ্টনকে ভিত্তি করিয়া রচিত হয় নাই, তেমনই আমাদের বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গেও উহার কোন সম্পর্ক নাই। ইহা আমাদের হৃদয়, আমাদের বুদ্ধি ও আমাদের কর্মকে সমভাবে পরিচালিত না করিয়া কেবল আমাদের বুদ্ধি বৃত্তিকেই তীক্ষ্ণ করিয়া তোলে—"It ignores the culture of the heart, the hand and confines itself singly to the head"—মহাত্মা গান্ধী। ইহা নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল এবং সেই সঙ্গেই একান্ত-ভাবে পুঁথিগত। সমস্ত ব্যবস্থাটার মধ্যে নড়িয়া চড়িয়া বসিবার কোন সুযোগ বা প্রয়োজন নাই। প্রাথমিক শিক্ষা হইতে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার প্রত্যেকটি অবস্থা এমন ভাবে প্রস্তুত যে এই প্রতেকটিই উচ্চতম শিক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাইয়া দিবার ধাপ বা সিঁড়ি মাত্র। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা হইতেই মনে করা হইত যে ছাত্রের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছান। বর্তমান শিক্ষার কোন অবস্থাই স্বয়ং পূর্ণ নহে। একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা শেষ

করিয়াই আমি যে জীবনসংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে সাহায্য পাইতে পারি, আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা এমন কোন খোরাক আমাদের দেয় না। কিংবা ম্যাট্রিক অথবা আই, এ পাশ করিয়া যে আমি জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারি, আমার ম্যাট্রিক বা আই, এ পাশও আমায় সে যোগ্যতা দেয় না। জীবনের বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে ঐ পাঠ্যবস্তুর কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া ঐ পাশগুলি আমাদের কোন সাহায্য করে না। এই কথাটাই গত পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাষণে বড় দুঃখে মাননীয় এম, আর জয়াকর মহাশয় স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি এই পদ্ধতিকে educational ladder বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। "...the intermediate stages are regarded as merely preparatory for the final stage and not as a preparation in themselves". মানুষ জগৎ ও জীবনকে শিক্ষা করে। কিন্তু আমাদের শিক্ষার পদ্ধতি ও সূচী এমনই অদ্ভুত যে আমরা বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক বিরহিত কতকগুলি বুলি মুখস্থ করি। ইহা জীবনের বৃদ্ধির পক্ষে কোন সজীব উপাদানের জোগান দেয় না; জীবনের অন্তর্নিহিত কার্য-তৎপরতাকে জাগাইয়া না তুলিয়া বরং নিস্তেজ করিয়া ফেলে। অপরদিকে শিক্ষাদান কাজটিও কিছুমাত্র সহানুভূতি লইয়া করা হয় না। শিক্ষা যে দেয় এবং যে গ্রহণ করে উভয়ের মধ্যে এই দেওয়া ও নেওয়া কর্মটি যদি সহানুভূতি, প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃত না হয়, তবে সমস্ত কর্মটাই ব্যর্থ হইয়া যায়, একথা দৃঢ়ভাবেই বলা যায়। শিক্ষাদান ব্যাপারের প্রথম কর্মকর্তা হইতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক

পর্যন্ত কেহই ইহাকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেন না। কর্তৃপক্ষকে কিছু করিতে হইবে, তাই তাঁহারা করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকও শিক্ষাদান কার্যের গুরুত্ব যেমন বুঝেন না, ছাত্রদেরও আপন বলিয়া মনে করেন না। ইহার কারণ এই যে আমরা প্রত্যেকে মিলিয়া মিশিয়াই বাঁচিয়া আছি, কাহাকেও বাদ দিয়া কেহ বাঁচি না, ঐ ছাত্রদের মধ্যে আমার দেশের ভবিষ্যতই বাঁচিয়া থাকিবে —এ সকল কথা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কেহই ভাবিয়া কর্মে অগ্রসর হয় না। জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক-বিরহিতি এবং সহানুভূতির অভাব এই দুই কারণই শিক্ষার অগ্রগতির প্রধান অন্তরায়, আসল কারণ; পূর্বলিখিত বাহিরের বাধাগুলি মস্ত বড় কথা নহে। আমাদের আজিকার শিক্ষা ব্যবস্থাটা যেন টবে লাগান গাছ, বাহির হইতে আনিয়া দড়িদড়া দিয়া শূন্যে টাঙ্গাইয়া রাখা হইয়াছে অপরকে দেখাইবার জন্য, শোভাও কিছু আছে, কিন্তু পৃথিবীর মাটির সঙ্গে যেমন সম্বন্ধ নাই, কাজেও বিশেষ লাগে না।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে শিক্ষা সকলের জন্য ছিল না বলিয়া আমরা লজ্জা বোধ করি। আজ সমাজের সকল স্তরের কাছেই শিক্ষার দুয়ার খুলিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু সকলের নিকট ইহা পৌঁছায়ই নাই, এমনই ইহার অপ্রাচুর্য—এজন্য কি লজ্জা পাইব না? শিক্ষিতের শতকরা সংখ্যা কত তাহা পূর্বেই দেখিয়াছি। আজ আমরা শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝি, ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনকালে শিক্ষা বলিতে তাহা বুঝাইত না। লিখিতে পড়িতে, কিছু অঙ্ক করিতে ও হিসাব রাখিতে সক্ষম হওয়াকেই

আজ শিক্ষা বলি, কিন্তু সে সময়ে শিক্ষা বলিতে জীবনের একটা সংস্কৃতি বুঝাইত—যদিও তাহারা অনেকেই হয়তো লিখিতে ও পড়িতে পাইত না। যুগ পরিবর্ত্তনে আজ অবশ্য লিখিতে ও পড়িতে পারাটা অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই ইহা শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বটে। কিন্তু আজ শিক্ষার মন্দির স্থানে স্থানেই দেখা গেলেও আজিকার দিনের দৃষ্টিতেই শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা হ্রাস বই বৃদ্ধি পায় নাই—প্রকৃত শিক্ষা বা সংস্কৃতির কথা ছাড়িয়াই দিলাম।

আজ প্রাথমিক শিক্ষার যে ব্যবস্থা চলিতেছে তাহার ফলাফল দেখিয়া তাহার কারণ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট রিপোর্টগুলিও এইরূপ। ১৯৩৭ সনের ২৬শে জুন মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রেসনোটে যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্মার্থ এই—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-সূচী ছাত্র ও অভিভাবক কাহারও জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। গ্রামের পক্ষে এই কথাটি বিশেষ ভাবেই প্রযোজ্য। যদি গ্রামের বিদ্যালয়কে গ্রামের শিশুর পক্ষে প্রকৃত মঙ্গলজনক করিতে হয়, তবে পাঠ্যবস্তুকে শিশুর আবেষ্টনীর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। যে গতানুগতিক বিষয় গতানুগতিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা শিশুকে বিশেষভাবে বিদেশী মনোভাবাপন্ন করিয়া তুলিতেছে। ইহাতে শিশু নিজেকে নিজের চারিদিকের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে পারিতেছে না। প্রকৃতি পাঠ (nature study) বলিয়া একটা পাঠ্য বিষয় আছে। উহা পড়ান হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে প্রকৃতির বিভিন্ন পদার্থের

সঙ্গে শিশুর কোন সাক্ষাৎ পরিচয়ই হয় না। বইর মধ্যে বা শিক্ষকের মুখে মুখেই প্রকৃতিপাঠ সমাপ্ত হইয়া যায়। পর্যবেক্ষণ শক্তি উদ্বোধনের জন্য কোন প্রচেষ্টাই হয় না। বাগানের কোন কাজ হাতে কলমে করান হয় না। এই শিক্ষা শিশুকে তাহার পল্লীজীবন ও পৈত্রিক ব্যবসা হইতে দূরে সরাইয়া দিতেছে, সুন্দরভাবে গ্রাম্য জীবন যাপন করিতে কোন সাহায্যই করিতেছে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে স্বল্প শিক্ষিত শিক্ষক, প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিবার দ্রব্যের অভাব এবং সর্বোপরি ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাসূচী ও শিক্ষাপদ্ধতি—শিশুর জীবনের আবেষ্টনের সঙ্গে যাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই—এই সকলের জন্যই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, চেষ্টার অপচয় হয় মাত্র। ১৯৩২ সনে বোম্বাই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কমিটিও অনুরূপ কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতেও শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রের আবেষ্টনের কোন সম্পর্ক নাই। শিক্ষকের শিক্ষাও অতিরিক্ত মাত্রায় পুঁথিগত।...প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অপচয় অত্যন্ত বেশি; অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া থাকে। এই প্রাথমিক শিক্ষার অচল অবস্থা, অপচয় প্রভৃতির কারণ প্রকৃত শিক্ষাদানের অভাব। শতকরা প্রায় ৫০টি বিদ্যালয় এক শিক্ষকের অধীন, সেই শিক্ষকেরাও আবার উপযুক্ত নহেন। যাহা হউক, আদর্শ শিক্ষা তো দেশে নাইই, কর্তৃপক্ষ যাহা দিতে মনস্থ করিয়াছেন, শিক্ষাদান পদ্ধতি, সূচী, শিক্ষক প্রভৃতির ত্রুটিতে তাহাও উপযুক্ত ভাবে ফলপ্রসূ হইতেছে না। স্যার ফিলিপ হারটগের Some Aspects of Indian Education

Past and Present নামক পুস্তকে আছে যে যদি ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর শতকরা সংখ্যা ১৪ ধরা যায়, তাহা হইলে এই শতকরা ১৪র মধ্যে ১৯১৭ হইতে ১৯২৭ সন পর্যন্ত বালক শতকরা ৩০·৩ হইতে ৪২·১ এবং বালিকা শতকরা ৬·৭ হইতে ১০·৪ পর্যন্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হয় এবং ১৯৩৬ সনে বালকের সংখ্যা শতকরা ৫১ এবং বালিকার সংখ্যা শতকরা ১৭ পর্যন্ত উঠে। স্যার ফিলিপের মতে ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থায় এইভাবে টাকা ও শক্তির একটা বড় রকমের অপচয় ঘটিতেছে! অপচয় (wastage) অর্থাৎ যতজন শ্রেণীতে ভর্তি হয়, শেষ পর্যন্ত ততজন না থাকা, অচল অবস্থা (stagnation) অর্থাৎ একই শ্রেণীতে এক বৎসরের অধিক কাল থাকা এবং প্রাথমিক পাশ করিবার কিছুদিন পরে তাহাও ভুলিয়া যাওয়াই (Relapse into illiteracy) শিক্ষার এই পরিণতির কারণ। এবং অপচয়, অচল অবস্থা ও পূণর্মূসিক হওয়ার মূলে রহিয়াছে শিক্ষাদান পদ্ধতি, ইহার পাঠ্যবস্তু প্রভৃতি অনেক কিছুরই ত্রুটি।

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়িয়া আমরা পুঁথিগত কতকগুলি বাক্য গলাধঃকরণ করি বটে, ভূগোল বিজ্ঞান অঙ্কও শিক্ষা করি বটে কিন্তু কোন আত্মীয়ের ক্ষেতটি আমার ক্ষেতের কোনদিকে অবস্থিত জিজ্ঞাসা করিলে তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারি না। কিংবা আমাদের দেশীয় সন তারিখ, তিথি রাশি জিজ্ঞাসা করিলেও নিরুত্তর থাকি। খনার বচনে যে কৃষিবিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা মুখে মুখেই লাভ করা যাইত, তাহাও হারাইয়াছি, আজিকার শিক্ষাসূচী হইতে তাহার পরিবর্তে কিছু লাভ করিতে

পারি নাই। এমন হয় যে আমাদের মধ্যে অনেকেই প্রাথমিক পরীক্ষা পাশের পর কিংবা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে দুইচারি দিন পড়ার পর পৈত্রিক বৃত্তি হেয়জ্ঞানে ত্যাগ করি, কিন্তু এমন কিছুই করিয়া উঠিতে পারি না, যাহাতে নিজের, পরিবারের, দেশের বা সমাজের কাজে লাগিতে পারি। তখন শুধু অর্থহীন ভারস্বরূপ জীবনের দুর্ভোগ টানিয়া চলিতে হয়। যদি আমরা প্রাথমিক শিক্ষা একেবারে না পাইতাম তবে গ্রামে থাকিয়া পৈত্রিক ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিয়া আর কিছু না হউক নিজের ভরণপোষণটি করিতে পারিতাম। আজ বিকৃত, প্রাণহীন ও অকার্যকরী একটি শিক্ষা পাওয়ার ফলে আমাদের কিছুই হইতেছে না।

আজ প্রত্যেকেরই মন শহরমুখো হইয়া পড়িয়াছে ; যাহারা উক্তরূপ শিক্ষা পাইতেছে তাহারা দলে দলে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছে। গ্রামের জনসাধারণকে সাহায্য করিবার জন্য, বর্তমান আবেষ্টনের মধ্যে গ্রামের কৃষককে পথ দেখাইবার জন্য কেহই গ্রামে থাকিতেছে না। এদিকে আজকাল গ্রামে বাস করার সুখ সুবিধাও কমিয়া গিয়াছে। শহরে কতকগুলি সুবিধা বিশেষতঃ কতকগুলি সৌখিনতার কেন্দ্র থাকাতে গ্রামগুলি শূন্য হইয়া যাইতেছে। অন্ততঃ ম্যাট্রিক পর্যন্ত পাশ করিবার মোহ ও প্রয়োজনবোধে যাহারা গ্রাম ত্যাগ করিতেছে, তাহারা আর গ্রামে ফিরিয়া যাইতেছে না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্ত কাঠামো না বদলাইয়া শুধু গ্রামে ফিরিতে বলিয়াও কোন লাভ নাই।

বর্তমানে অর্থাৎ ১৯৩৮ এবং পরবর্তী সময়ে যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় চলিতেছে এবং ইহারও পূর্বে যে-ব্যবস্থা সমস্তদেশে চলিতেছিল তাহার শেষফল অর্থাৎ কতজন ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতেছে, তাহার হিসাব লইলে আমাদের অত্যন্ত হতাশ হইতে হয়; ইহা পূর্বেই কিছু দেখিয়াছি। শুধুমাত্র বাৎসরিক পাশের সংখ্যাও সমস্ত জনসমাজের পক্ষে নগণ্য; ইহাতে বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আশান্বিত হইবার কিছুই নাই। প্রথম শ্রেণীতে যাহারা ভর্তি হয় তাহাদের কত সংখ্যা চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত টিকিয়া থাকে, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে —ময়মনসিংহে ১৯৩৮ সনে প্রথম শ্রেণীতে যাহারা ভর্তি হইয়াছিল তাহার মধ্যে শতকরা মোটে ১১ জন এবং ১৯৩৯ সনের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রের শতকরা মোটে ১৪ জন প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা দিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় সাধারণতঃ ৭৫ হইতে ৮০ জন পাশ করে অতএব যদি প্রথম শ্রেণীতে ১০০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়, তবে তাহাদের মধ্যে মাত্র ৮ হইতে ১০ জন প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। অতএব বর্তমান অবস্থায় শিক্ষা কিরূপ বিস্তৃত হইতেছে, বুঝিতে কিছু কষ্ট হয় না।

প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের স্থান ও অবস্থা বড়ই শোচনীয়। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুইচারিজন মেয়ে পড়ে। প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা খুব কম মেয়েই দিয়া থাকে। কিন্তু দেশের দিক হইতে যেমন, ব্যক্তির দিক হইতেও তেমনি মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজন

খুব বেশি। বর্তমান যুগের আবেষ্টনের সঙ্গে চলিতে হইলে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেই হইবে। যদি সত্যিকারের শিক্ষার কথা তুলি, তবে দেখিব "নারীর" শিক্ষা যাহাকে বলে, তাহা আমাদের দেশে কোথাও নাই। প্রাথমিক ক্ষেত্র তো দূরের কথা। নারীর ক্ষেত্র পুরুষের ক্ষেত্র হইতে পৃথক, স্বতন্ত্র উপাদানে তাহারা প্রত্যেকে গঠিত। তাই প্রকৃত শিক্ষা দিতে হইলে প্রত্যেকের স্বতন্ত্রতা ও পৃথক ক্ষেত্রকে স্মরণ রাখিয়া শিক্ষাব্যবস্থা করা দরকার। নারী প্রাণপ্রধান, দরকার তাহার এই প্রাণের সঙ্গে বুদ্ধিকে মিলাইয়া দেওয়া। পুরুষ বুদ্ধিপ্রধান, শিক্ষাদ্বারা তাহার প্রাণকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু আমরা নারীপুরুষ উভয়কেই একই ব্যবস্থার মধ্যে ফেলিতে যাইয়া ব্যর্থ হইতেছি। প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় যতটুকু শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা আজ নারীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই প্রয়োজনীয় বটে। কেননা মাতৃভাষা পড়িতে ও লিখিতে পারা, সাধারণ অঙ্ক কষা ও হিসাব রাখা এবং ভূগোলে পৃথিবীর প্রকৃতির ইতিহাস ও সেই প্রকৃতিকে মানুষ কিভাবে বিভাগ করিয়াছে তাহা জানা এবং ইতিহাসে পৃথিবীর অতীত ও বর্তমান মানুষের ইতিবৃত্ত জানা—বর্তমান সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক যুগ-ব্যবস্থায় প্রয়োজন বটে। কিন্তু যে-মেয়েদের সমস্ত জীবনের শিক্ষা ঐটুকুতেই সমাপ্ত হইয়া যাইবে, তাহাদের জন্য নারীজনোচিত শিক্ষাও কিছু কিছু এই সময়ের মধ্যেই দেওয়ার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। কিন্তু তাহার কোন সত্যিকার আয়োজন দূরে নিকটে কোথাও দেখা যায় না। যে শিক্ষাটুকু মেয়েরা বর্তমান ব্যবস্থা হইতে পাইতে পারিত, তাহাও মেয়েদের লওয়া হয় না। এজন্য

আমাদের নানাবিধ সংস্কারকে দায়ী করা হয়। কিন্তু বলিবার কী আছে? যাহা প্রকৃত শিক্ষার উপায় নহে, যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় ছেলেদেরই কোন কাজ দিতেছে না, তাহা লইয়া মেয়েরাই বা কী করিবে? যদি ইহা ছেলেদের মধ্যে প্রকৃত উন্নতি আনিয়া দিত, তবে সকল অসুবিধা সত্ত্বেও মেয়েরা এ শিক্ষা লইতে কুণ্ঠিত হইত না—একথা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে। যে ব্যবস্থা আছে তাহা সমস্ত দেশের প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প, তাহার ফলের হিসাব নৈরাশ্যজনক, তাহা আমাদের পৈতৃকবৃত্তি ও গ্রাম হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে, আমাদিগকে জীবনসংগ্রামে উপযুক্ত করিয়া তুলিতেছে না—এককথায় বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতে আমরা সত্যিকার কিছু লাভ করিতেছি না। এইরূপ একটা ব্যবস্থায় মেয়েদের স্থান নাই। অতএব পরিবর্তন দরকার।

জর্জ এণ্ডারসন মহাশয়ের মতে—"The education system itself is at fault···education and those who take part in it have been stifled and rendered impotent by a soul-destroying system. It is the Framework that is at fault; and those who but for that framework would have painted a beautiful picture have been powerless to do so." এই system বদলাইতে হইলে অনেক কিছুরই পরিবর্তন আবশ্যক। এবং সেই পরিবর্তন আনিতে হইলে দেশ-সমাজ-জাতি-পরিবার ও ব্যক্তি সম্বন্ধে আমাদের মনোবৃত্তি বদলাইতে হইবে। প্রথম অধ্যায়ে

আমরা বলিয়াছি যে আমাদের পাঠ্যসূচী, পদ্ধতি, শিক্ষক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ত্রুটি রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের বর্তমান মনোবৃত্তি অটুট রাখিয়া কেবল পাঠ্যবস্তু ও পদ্ধতি বদলাইলে কি হইবে? পুরান পাত্রে নূতন সুরা ঢালিয়া লাভ কি? দেশ সমাজ জাতি পরিবার ও ব্যক্তি সম্বন্ধে পূর্বে আমাদের ধারণা বদলাইতে হইবে। ইহাদিগকে মৃত মনে করিয়া, ইহাদের প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকের সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া কেবল নিজের সুখ সুবিধার কথা চিন্তা করিবার মনোবৃত্তি লইয়া চলিলে যে নিজেরই সুখ সুবিধা পাওয়া হয় না, একথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। সমাজের সকলের সঙ্গে যে আমারও সুখ সুবিধা তদনুরূপ হইয়া আসিতে থাকিবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি যদি আমার দেশ সমাজ জাতি ও পরিবারকে ভালবাসিতে না পারি, তাহাদের জন্য আমাদের যদি কোন সহানুভূতি না থাকে, তবে কি শিক্ষাই বা দিব, কি শিক্ষাই বা লইব?

এই এতবড় সমস্যার সমাধান করিতে সব কিছুরই আমূল পরিবর্তন দরকার। শিক্ষাক্ষেত্রে সেজন্য প্রথমেই ওয়ার্ধা পরিকল্পনার কথা মনে হয়। কিন্তু এ দুর্ভাগা দেশে তাহা চলিল না। কোনরূপ আমূল পরিবর্তনের অনুপস্থিতিতে কতদূর কি করা যায়, আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সে সম্বন্ধে দুইচারি কথা বলিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

শিক্ষক

শিশুই শিক্ষার কেন্দ্র বটে, কিন্তু সেই শিশুকে শিক্ষকই চালনা করিয়া লইয়া আসিবেন। অতএব শিক্ষা ব্যাপারে শিক্ষকের স্থান অকিঞ্চিৎকর তো নয়ই, বরং তাঁহার কর্তব্য ও স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষকের স্থান ও কর্তব্য আরও গুরুতর কেননা প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পক্ষে শিক্ষার ইহাই একমাত্র স্থান ও সময়। ইহার পরেই তাহারা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে। দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধি-সমন্বিত একটি শিশুকে পূর্ণাঙ্গ মানব করিয়া তুলিবার সকল দায়িত্ব ও গৌরব তাই এই শিক্ষকদেরই। প্রতিটি বালককে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মানব প্রস্তুত করিতে শিক্ষকেরই কর্তব্য। তদুপরি এক একটি গ্রামের পক্ষে শিক্ষক নেতার কাজ করিতে পারেন। সাধারণ-ভাবে গ্রামের অন্যান্য প্রায় সকলেরই অপেক্ষা তাঁহার জ্ঞান বিদ্যাবুদ্ধি অধিক এবং একটা পড়াশুনার আবহাওয়ার মধ্যে থাকার দরুণ দেশবিদেশের তাজা খবর তিনি রাখিবেন, ইহাই স্বাভাবিক। তাই কেবল তাহার বিদ্যালয়ের শিশুদের পক্ষেই যে তিনি অনেকখানি কথা তাহা নয়, সমস্ত গ্রামেই তাঁহার একটা স্থান ও কর্তব্য আছে। গ্রামের বিভিন্ন সমস্যায়, ভালয় মন্দে সকলে শিক্ষকের মতামতের অপেক্ষা করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। গ্রামের ছোটবড় সকলের মধ্যেই শিক্ষক সেবা বুদ্ধি লইয়া বিচরণ করিবেন। ইহা একান্ত কাম্য।

বাংলাদেশে শিক্ষকের সংখ্যা কত তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে যদি অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে সমস্ত বাংলাদেশে প্রবর্তন করা যায় তবে ৬০ লক্ষ ছাত্রের জন্য অন্ততঃ দুই লক্ষ শিক্ষক বাংলাদেশে শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত থাকিবেন। তাহাদের আনুমানিক বয়স কত তাহা স্থির করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষকের বয়সের আনুমানিক গড় বাহির করা সম্ভবপর নয়, কারণ প্রতি জেলায় জেলা স্কুলবোর্ড স্থাপিত হয় নাই। প্রথমে ময়মনসিংহ জেলায় ১৯৩৮ খ্রীঃ-এ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করা হয়। এই জেলার শিক্ষকের বয়সের আনুমানিক গড় সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার শিক্ষকদের বয়সের আনুমানিক গড় সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাইতে পারে। ১৯৩৮-এ ময়মনসিংহে যে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইল, তাহার পূর্বে যেসকল পাঠশালা ছিল, তাহাদের অধিকাংশ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৯০টি এক-শিক্ষকের পাঠশালা ছিল। ১৯৩৮-এ এই সকল শিক্ষকদের কি ব্যবস্থা হইল? সরকার আইনে বলিলেন যে এখন হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের ম্যাট্রিক পাশ হওয়া চাই-ই। কিন্তু পূর্বের শিক্ষকগণ বেশির ভাগই ম্যাট্রিক পাশ করেন নাই। তাই একটা পরীক্ষা লইয়া তাঁহাদিগকে বর্তমান ব্যবস্থায় গ্রহণ করা হইল। ইহাদের শতকরা সংখ্যা হইবে ৫০। যে সমস্ত ম্যাট্রিক পাশ শিক্ষক পূর্ব হইতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছিলেন, তাঁহাদের শতকরা সংখ্যা অত্যন্ত কম। শতকরা ১০ও হইবে না।

যাহারা ম্যাট্রিক পাশ ছিলেন তাহাদের লইয়া শতকরা ৬০ জন হইল। পূর্বের ম্যাট্রিক পাশ-না-করা শতকরা ৫০ জনের বয়সের যদিও কোন বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান হয় নাই, তথাপি অনুমান করা যায় যে তাঁহাদের বয়সের আনুমানিক গড় ৪৫-এর কম হইবে না। যাঁহারা পূর্বের ম্যাট্রিক পাশ এবং ১৯৩৮-এর পরে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া যাঁহারা চাকুরী পাইয়াছেন এই দুই দলের শিক্ষকের বয়সের গড় ২২।২৩ হইবে। অতএব প্রাথমিক সকল শিক্ষকের বয়সের গড় ৩০ হইতে ৩৩-এর বেশি হইবে না। শিক্ষকতার পক্ষে ইহা উপযুক্ত বয়স বটে। ময়মনসিংহের শিক্ষকদের এই গড়পরতা হিসাব সম্মুখে রাখিয়া সমস্ত বাংলাদেশের শিক্ষকদের বয়সের একটা ধারণা করিলে দেখা যায় প্রাথমিক শিক্ষকদের এই দিকটা সন্তোষজনকই আছে।

ইহার পরেই শিক্ষকদের যোগ্যতার প্রশ্ন উঠে। ১৯৩৭-এর প্রস্তাবে সকল শিক্ষকই ম্যাট্রিক-পাশ হইবেন এই উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তাহা এ পর্যন্ত হয় নাই। বর্তমান যুদ্ধের পূর্বে ম্যাট্রিক পাশ শিক্ষক পাওয়া যাইতেছিল, কিন্তু যুদ্ধের সময় অনেকেই চলিয়া গিয়াছে। এসকল কারণে প্রাথমিক শিক্ষকদের অবস্থা চিন্তনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের ট্রেণিং দিবার জন্য যে কয়টি বিদ্যালয় আছে, তাহাও প্রয়োজনের অনুপাতে কম। সেইজন্য ১৯৪০ খ্রীঃএ সরকার প্রতি জেলায় কতকগুলি হাইস্কুলের সঙ্গে পাঁচ বৎসরের জন্য কতকগুলি ট্রেণিং কেন্দ্র খুলিয়াছিলেন। এই কেন্দ্রগুলিতে এই কয় বৎসরে বেশ অনেক-সংখ্যক শিক্ষককে ট্রেণিং দেওয়া হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ

বলা যায় ময়মনসিংহ জেলায় চারি বৎসরে প্রতি চারজন শিক্ষকের মধ্যে একজন শিক্ষক ট্রেণিং পাইয়াছেন। কিন্তু সংখ্যাটাই শিক্ষকের যোগ্যতার পরিচয় নহে, তাঁহারা কতদূর কি শিখিলেন তাহাই দেখিতে হইবে।

বর্তমানে ম্যাট্রিক-পাশ শিক্ষক পাওয়া দুরূহ বলিয়া ম্যাট্রিক ও উচ্চ মাদ্রাসা পাশ স্থলে নন-ম্যাট্রিক ও এফ্, এম্ পাশ শিক্ষক লওয়া হইতেছে। ধর্ম সম্বন্ধে এফ্ এম্‌দের উপযুক্ত জ্ঞান আছে স্বীকার করিয়াও একথা বলিতে হইবেই যে ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ইত্যাদি সম্বন্ধে ইঁহারা বিশেষ কিছু জানেন না। নন-ম্যাট্রিক শিক্ষকেরা বাঙ্গালা ও অঙ্কে একেবারেই কাঁচা। কিন্তু ইঁহারা সকলেই একবৎসরের ট্রেণিং উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষক বলিয়া বিবেচিত হইতেছেন। ইহারা শিক্ষকতার ট্রেণিং পাইলেন বটে কিন্তু বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে যাহাদের জ্ঞান এত অল্প, তাঁহারা এক বৎসরের ট্রেণিং পাইয়াই কি উপযুক্ত শিক্ষক নামের যোগ্য হইলেন? উপযুক্ত শিক্ষক হইতে হইলে শিক্ষাদানের বিশেষ পদ্ধতি কিংবা শিশুর মনস্তত্ত্ব জানা এবং সে সব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা যেমন প্রয়োজন, তেমনি শিশুর শিক্ষনীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধেও প্রয়োজনীয় ধারণাটুকু পরিষ্কারভাবে থাকা বিশেষ দরকার। প্রাথমিক শিক্ষকদের বহু বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট জ্ঞানলাভ করিতে হয়—এই এক বৎসরে কি তাহা সম্ভব? নন-ম্যাট্রিক শিক্ষকদের ট্রেণিংএর সময় বাড়াইয়া দুই বৎসর করিয়া প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়-গুলিই তাহাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। ১৯৪০-এ হাইস্কুলগুলির

সঙ্গে যে ট্রেণিংকেন্দ্র খোলা হইয়াছে, ১৯৪৪-এ সেগুলি বন্ধ না করিয়া চালাইয়া যাওয়াই উচিত হইবে। গ্রামের বালকের পক্ষে শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা কত তাহা পূর্বে বলিয়াছি। অতএব শিক্ষকদের যত অধিক যোগ্য করিয়া তোলা যায়, ততই মঙ্গল।

কিন্তু ক্রটির অন্ত নাই। কেবল যে ভাষা বা সাহিত্য শিখিবার জন্যই মাতৃ ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইবে তাহা নয়। মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন। যে কোন্ বিষয় শিখিতে ও শিখাইতে মাতৃভাষার শুদ্ধজ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষকদের উহা নাই। শুদ্ধ করিয়া দুইচারি লাইন বাংলা লিখিতে অনেকেরই বিশেষ বেগ পাইতে হয়। ইহার প্রতিকার একান্ত বাঞ্ছনীয়। ১৯৪০ সনের পূর্বে বাংলাতে একটি সাহিত্য অপরটি ব্যাকরণ, রচনা প্রভৃতি লইয়া দুইশত নম্বরের দুইটি পেপার ছিল। ইহাতে শিক্ষকেরা একটু মনোযোগ দিয়া পড়িতেন। কিন্তু ১৯৪০ সনে নূতন শিক্ষাসূচী প্রবর্তনের পর শিক্ষকগণ ম্যাট্রিক পাশ হইবেন বলিয়া সে ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। ম্যাট্রিক পাশ থাকিলেও সাধারণ ছেলেরা মাতৃভাষাতে যেরূপ দক্ষ হয়, তাহাতে ঐ দুই পেপার থাকাই বাঞ্ছনীয়। যে-কথা মনে মনে আছে, সে কথাও পরিষ্কার ও শুদ্ধ ভাষায় গুছাইয়া লিখিতে না পারা আমাদের ছাত্রদের একটি বিশেষ ক্রটি। এই অবস্থায় যদি তাহারা অপরকে শিক্ষা দিতে যায়, তবে অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় সহজেই অনুমেয়। তাই ট্রেণিংক্লাসে যেমন শিক্ষার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তেমনই শুদ্ধ করিয়া প্রকাশ

করার দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত। ট্রেণিংস্কুলে একটিমাত্র ৮০ পৃষ্ঠার বাংলা বই পড়ান হয়। সেই একটিও প্রাথমিক শিক্ষকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। বইটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর উপযুক্ত। অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর মান হইতে কিছু বেশি। কিন্তু যাহাদের জীবনে ঐ প্রাথমিক শিক্ষাই সারা জীবনের সম্বল, এত অল্পশিক্ষিত শিক্ষক-দের সাহায্যে তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করার যৌক্তিকতা নাই। কেবল বাংলাই নহে, শিক্ষকের শিক্ষনীয় অন্যান্য বিষয়েরও পরিবর্তন আবশ্যক। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া আমরা শুধু ইহাই বলিতে চাই যে শিক্ষকের এমন হওয়া দরকার যাহাতে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়েই তাঁহার জ্ঞান থাকে। "Primary syllabus prepares a boy for complete living." —এই কথাটি মনে রাখিয়াই শিক্ষক প্রস্তুত করা দরকার। পূর্বে বলিয়াছি ট্রেণিংএর সময় বাড়াইয়া দুই বৎসর করা দরকার; অতএব শিক্ষকের শিক্ষাসূচী বাড়ান সম্ভব। ইহা ছাড়া আমাদের মনে হয় যাঁহারা পরবর্তী জীবনে শিক্ষক হইতে চাহেন তাঁহারা ম্যাট্রিকক্লাসে কিংবা ট্রেণিং-এর সময় এবং তাহারও পরে ব্যক্তিগতভাবে কতগুলি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিতে থাকিবেন। জ্ঞান অর্জন করিবার শেষ কোন দিন হয় না। একটি বিষয় আয়ত্ত হইলেই দেখা যায় অপর নূতন প্রশ্ন, নূতন অধীতব্য বিষয় আয়ত্ত করার জন্য রহিয়াছে। নিত্য নূতন পরিস্থিতিতে জ্ঞান নূতনভাবে আসিয়া মানুষের জীবনে উপস্থিত হয়। শিক্ষককে এই পরিবর্তিত আবেষ্টন ও

পরিবর্তিত চিন্তাধারার সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে হইবে। গ্রাম্য শিক্ষককে অনেক শ্রেণী এবং বিভিন্ন বিষয় পড়াইতে হয়। একই শিক্ষককে সাধারণতঃ বাংলা, অঙ্ক, ভূগোল, বিজ্ঞান সমস্তই পড়াইতে হয় আবার হাতের কাজও করাইতে হয়। বাংলা, অঙ্ক প্রভৃতি সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা তো চাইই; ইহা ছাড়াও শিক্ষার্থীর ও তথা সমগ্র গ্রামেরই অনেক কাজে অকাজে যে তাঁহাকে লাগিতে হয় ইহা পূর্বে বলিয়াছি। সেইজন্য উপযুক্ত শিক্ষক হইতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধেও পরিষ্কার জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার বলিয়া বোধ হয়। (১) দেশের কৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞান এবং দেশ ও সমাজের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান। (২) সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র, গাছপালা এবং কৃষি সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত প্রাথমিক জ্ঞান। (৩) বিভিন্ন হাতের কাজে দক্ষতা। (৪) শিক্ষাদানের ও শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্ব ও তাহার ক্রমোন্নতি এবং নূতন নূতন শিক্ষার ধারার সম্বন্ধে জ্ঞান। এই সকল জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শিক্ষককে যেমন বিভিন্ন পুস্তক পড়িতে হইবে, তেমনই আর একটি প্রধান প্রয়োজন হইতেছে চক্ষু খুলিয়া চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া চলা। চোখ ও মনের দৃষ্টিকে সদা জাগ্রত রাখিয়া না চলিলে জ্ঞান অর্জন অসম্ভব।

প্রাথমিক শিক্ষকদের উচ্চারণ সম্বন্ধেও কিছু বলিতে পারা যায়। শিক্ষকেরা সাধারণতঃ কথা বলিবার সময় প্রত্যেকের কথ্য ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন—তাহাতে খুব বেশি একটা ক্ষতি করে না। কিন্তু পুস্তকের সাধুভাষা শিক্ষা দিতে যাইয়াও

যখন তাহারা কথ্য ভাষার আশ্রয় লন, তখন তাহা নিতান্ত দুঃখের কারণ হয়। যেমন শিশুকে কুকুর বিড়াল শিয়াল বুঝাইতে "কুত্তা, বিলাই ও হিয়াল" বলিয়া বুঝান হয়। পড়িতে পড়িতে শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে শিশু উহাকে ক্রমে "কুত্তা, বিলাই, হিয়াল"ই পড়িতে থাকে; পুস্তকের সাধুভাষা আর তাহার শেখা হয় না। ইহা ভাষাশিক্ষাকে ব্যাহত করে। আর শিক্ষকেরা সকল সময়ই কথ্যভাষা ব্যবহার করিলে শিশুর পক্ষে সাধুভাষা শিক্ষা করা কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমাদের মনে হয় ট্রেণিং স্কুলে ১০০ নম্বরের ব্যবস্থা করিয়া সঠিক উচ্চারণের একটা পরীক্ষা থাকা বাস্তব প্রয়োজন। যে এই উচ্চারণের পরীক্ষায় পাশ না করিবে, তাহাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে বাংলা পড়াইতে দেওয়া উচিত নয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের এই পরীক্ষায় পাশ থাকা অপরিহার্য।

শিক্ষককে চারিবৎসর ধরিয়া বিভিন্ন বয়স ও বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন বিভিন্ন রকমের ছাত্রছাত্রীকে পড়াইতে হয়। এজন্য সমস্ত শিক্ষাব্যাপারটিকে আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে। নূতন নূতন জ্ঞান ও তথ্য যেমন দিতে হইবে তেমনি শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষককে ব্যক্তিগতভাবে আনন্দময় হইয়া উঠিতে হইবে। শিক্ষকের প্রতি যেন শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মিয়া যায়, শিক্ষক-বস্তুটিকে যেন শিক্ষার্থী এতটুকু ভীতির চক্ষে না দেখে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। একবার যদি ভীতি বা বিরক্তি বা বিদ্বেষ বা হিংসা জন্মিয়া যায়, তবে শিক্ষা সেখানে

ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কেননা শিক্ষার দান ও লাভের গোড়ার কথা হইতেছে শ্রদ্ধা। শিক্ষককে যেমন শিশু শ্রদ্ধা করিবে, শিশুকেও শিক্ষক কেবল যে স্নেহ করিবেন তাহা নয়, সেই স্নেহের মধ্যেও শ্রদ্ধা থাকিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষককে কোন একটি বিষয়ে একান্ত বিশেষজ্ঞ হইবার দরকার নাই। তাঁহাকে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের জ্ঞানের আধার হইতে হইবে। জ্ঞান ও তথ্য আহরণে যেমন নিত্য নূতনের সঙ্গে তাল রাখিতে হইবে, তেমনই অন্তরের দিক হইতেও শিক্ষককে সর্বদা নূতন থাকিবার সাধনা করিতে হয় যাহাতে শিক্ষার্থীর কাছে তিনি পুরাতন হইয়া না যান। বর্তমানকালে শিশুকে তাহার মনোবিজ্ঞান সম্মত উপায়ে শিক্ষা দিতে হইবে, ইহা শিশু-শিক্ষার একটি বিশেষ কথা। শিশুকে শিক্ষকের চিনিতে হইবে। তাহার বুদ্ধি, তাহার সামর্থ, তাহার ঝোঁক বা প্রবণতা, তাহার বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সমস্ত সম্বন্ধেই শিক্ষক অভিজ্ঞ থাকিবেন—এক কথায় শিশু নামক বস্তুটির সমগ্রটুকুর সঙ্গে পরিচিত হইলেই তবে শিক্ষকদের পক্ষে শিশুর প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষাদান সম্ভব হইবে। শিশুকে তাহার সবটুকুতে জানিতে হইলে শিক্ষক সর্বদা তাহার প্রতি নিঃস্বার্থ স্নেহ ও শুভেচ্ছার দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেন। এতগুলি শিশুর প্রত্যেকের ব্যক্তিকে জানিতে হইবে, আবার প্রত্যেকের অপেক্ষা বড় থাকিতে হইবে। অর্থাৎ ঐ প্রত্যেকটি শিশু-ব্যক্তি যেন শিক্ষকের মধ্যে নিজের নিজের প্রয়োজনের খাদ্য পায়—শিক্ষককে এতখানি বড় হইতে

হইবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। শিক্ষকদের নিজেদের যদি বিভিন্ন বিষয়ে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বৃদ্ধি না থাকে, তবে তিনি ছাত্রদেরও বৃদ্ধির কাজে সহায়ক হইতে পারিবেন না। শিক্ষা একটি জীবন্ত ব্যাপার, ইহা একটি জীবন হইতে অপর একটি জীবনের সৃষ্টি। শিক্ষকদের যাহা দোষগুণ থাকিবে ঐ শিশুছাত্রদের মধ্যে সেই সবই প্রবেশ করিবে, যেমন পিতামাতা বা পালনকারীর জীবন শিশুতে সংক্রামিত হয়। শিক্ষকের জীবন শিশুর পক্ষে এতখানি কথা ইহা মনে রাখিয়া শিক্ষককে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। তাই শিক্ষক যদি নিজেকে সদা জাগ্রত রাখেন, নূতন কিছু গ্রহণ করিবার ঔৎসুক্য যদি তাহাকে অনুপ্রেরণা দেয় এবং যদি প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে দিবার মত বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকে—তবে এই সকলের সমন্বয়ে তাঁহার জীবনের যে-বৃদ্ধি তাহা ছাত্রদের মধ্যে বর্তাইবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষাদান ব্যাপারে কি কি উপকরণ ব্যবহার করিতে পারেন? একটা কথা আছে "one picture worth thousand words."—একটি ছবি হাজার কথার সমান। মানুষ কেবল পুস্তক পড়িয়া শেখে না, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া সে গ্রহণ করে। দেখিয়া শুনিয়া, স্পর্শ করিয়া—সমস্তভাবেই সে শিক্ষা করে। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে লোকে রামায়ণ শিখিত গানের মধ্য দিয়া—এই রকম গান ও ছড়ার মধ্য দিয়া সে আরও কত

কিছু শিখিতে পাইত। পুস্তক ছাড়া শিক্ষার আর দুইটি প্রধান সহায়ক হইতেছে—বস্তুদর্শন ও পরিভ্রমণ। যাহা পড়ান হয় তাহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞান দেওয়া হইলে উহা পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী হয়, শিক্ষা জীবন্ত হইয়া উঠে। কেবল পুস্তকে যাহা পড়িল তাহাই যে দেখাইতে হইবে তাহা নয়; পুস্তকে যাহা নাই এমন বস্তু ও বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান নানা জিনিস দেখিয়া শুনিয়া ও দেশপরিভ্রমণে লাভ করা যায়। শহরে সিনেমা, ম্যাজিক লণ্ঠন, মিউজিয়ম ইত্যাদি নানা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পাওয়া যায়। গ্রামে সে সকলের অভাব। তাই গ্রামের শিক্ষককে নিজের ও ছাত্রদের সমবেত চেষ্টায় কতকগুলি কাজ করিতে হইবে। গ্রামের একটা বিশেষ সুবিধা এই যে প্রাকৃতিক আবেষ্টন আমাদের একেবারে সহজলভ্য। এমন অনেক কিছু আছে যা শহরের শিশু চোখে দেখে নাই অথচ যাহা সে প্রতিদিন ব্যবহার করে বা পড়ে। গ্রামের শিক্ষক পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক এই আবেষ্টনের সুযোগ লইয়া শিশুকে সেই সকল বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দিবেন। ইহা ছাড়া ছবি সংগ্রহ একটি বিশেষ কথা। শিক্ষক নিজের জন্য একটি ও বিদ্যালয়ের জন্য একটি file প্রস্তুত করিবেন। খবরের কাগজ হইতে নানাবিধ ছবি—দেশ বিদেশের, নানা ঘটনার ও বিভিন্ন বস্তুর—ছবি সংগ্রহ করিবেন। সংগৃহীত—ছবিগুলির নামের একটা তালিকা থাকিবে। প্রতি ছবির উপর ছোট কাগজে file-এর নম্বর, বিভাগ-এর নম্বর দিয়া রাখিতে হইতে। প্রতি বিদ্যালয়ে একটি ছোটখাট মিউজিয়মও

তৈয়ার করিতে হইবে। শামুক, প্রস্তরীভূত কাষ্ঠখণ্ড, পাথর, কয়লা, নানারূপ মৃত সরীসৃপ, ঝিনুক, প্রবাল ইত্যাদি অনেক কিছুই গ্রামের আবেষ্টনী হইতে ছাত্রদের সাহায্যে শিক্ষক সংগ্রহ করিবেন। মানুষের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ইহা সংগ্রহ করিতে হয়। ইহা ছাড়া পাখীর বাসা, বোলতার বাসা, ফড়িং, নানাপ্রকার বীজ, নানাগাছের পাতা, ঘাস, ফল ইত্যাদিও সংগ্রহ করা দরকার। ক্লাসে প্রকৃতিপাঠের জন্য যাহা পড়িতে হয়, তাহাও সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে।

ভ্রমণ শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ। গ্রামের শিশুদের গ্রামের মধ্যে এবং গ্রামের সন্নিকটে দ্রষ্টব্য স্থান ও বস্তু দেখান প্রয়োজন। দেখার মত বিশেষ কিছু না থাকিলেও যাহা সাধারণ, শিক্ষকেরা তাহার মধ্য হইতেই চাহিয়া দেখিবার মত বস্তুটি শিশুদের নিকট ধরাইয়া দিতে পারেন। শিশুরা অবাক হইয়া দেখিবে যাহা তাহারা প্রতিদিন দেখিত, তাহার মধ্যেও নূতন জিনিস পাওয়া যায়।

পূর্বে বলিয়াছি আবেষ্টনের সঙ্গে তাল রাখিয়া আবেষ্টনীর সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া বর্তমান যুগে অপরিহার্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীর নিকট সাধারণতঃ কোন সমস্যাজনক ব্যাপার—সে পুঁথিগত জ্ঞান কিংবা সমাজ ও দেশ সম্বন্ধে কথা হউক—উপস্থিত করা বাঞ্ছনীয় নহে। সে তাহার চারিদিকে যাহা কিছু দেখে—এই আকাশ, বায়ু, জল, বৃষ্টি, চন্দ্র, সূর্য, তারা, ধান, পাট ইত্যাদিকে সহজ ভাবেই গ্রহণ করিবে। শিক্ষক দেখিবেন যেন তাহার

জ্ঞান বিজ্ঞানসম্মত হয়। দেশ ও সামাজিক ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাহাকে সাধারণভাবেই জ্ঞান দান করিতে হইবে। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রের নিকট যে-সকল বিষয়ে সমস্যা আছে, তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে। গ্রামের যে ছেলেকে ঐখানেই শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কর্মজীবনে প্রবেশ করিতে হইবে, তাহাকে সমাজ দেশ ও বিশ্বের সকল কথা কিছু না কিছু জানাইতে হয়। বাংলা, ভূগোল, ইতিহাসের পাঠ্য অংশটুকুর মধ্য দিয়াই পাঠ্য অংশটুকুকে ছাড়াইয়া দেশ, সমাজ ও বিশ্বের সম্বন্ধে কতকগুলি জ্ঞান প্রাথমিক শিক্ষার তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে দিতে হইবে। ইহাতে শিক্ষা আনন্দপূর্ণও হইবে।

কাহারও জন্মগত বা অন্য যে কোনও ত্রুটিকে সর্বদা সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। ইহা লইয়া হাসি-ঠাট্টা করা শিক্ষকের তো শোভা পায়ই না; অপর ছেলেরা যাহাতে না করে, সহজ ভাবেই তাহা লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষকের একটি প্রধান কাজ ছাত্রের পৈত্রিক বৃত্তির প্রতি তাহার স্বাভাবিক প্রীতি জন্মাইয়া দেওয়া। অনেক-সময়ই অভিভাবকেরা সন্তানদের এই দুঃখেই বিদ্যালয়ে দিতে চান না যে বিদ্যালয়ে দুই কলম লেখাপড়া করিয়া ছেলেরা তাহাদের পৈত্রিক বৃত্তিকে অবজ্ঞার চোখে দেখিতে থাকে, নিজের জাতব্যবসা ছাড়িয়া 'বাবু' হইয়া পড়ে কিংবা শহরের নানা সৌখিন আবেষ্টনীর মধ্যে আসিতে চায়। কর্মের একটি নিজস্ব

মূল্য আছে ; কোন কর্মই হীন নহে—চামারের জুতাসেলাই হইতে ধর্মদাতার মন্ত্রোচ্চারণও জীবনে সমানভাবেই প্রয়োজনীয়। জীবনে মেথর বা ধোপার স্থান শিক্ষক বা ধর্মদাতা হইতে নীচে নয়। যাহার যথাস্থানে তাহার মূল্য অপরিসীম। অতএব কোনও কর্মকে অবজ্ঞা করিবার অধিকার কাহারও নাই। প্রত্যেক কর্মদ্বারাই সমাজ, দেশ ও জাতির সেবা করা যাইতে পারে এবং আমাদের তাহাই করা উচিত। শহরে আসিয়া এটা ওটা চাকুরী করা অপেক্ষা গ্রামে থাকিয়া প্রত্যেকের বৃত্তি অনুযায়ী কাজ করা ভাল একথা সহজেই বলা চলে—কেননা পরের চাকুরী করার মধ্যেই একটা দীনতা আছে। শহরের কেরানীগিরি করা গ্রামের চাষাগিরি অপেক্ষা বেশি সম্মানজনক, এ ভুল ভাঙ্গিতে হইবে। সমস্ত সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে কৃষক-সমাজ—এককথায় গ্রাম। মানুষ তো শুধু টাকা লইয়া বাঁচে না, চাল ডালও তাহাকে খাইতে হয়। তাই কাহারও অপেক্ষাই কেহ হীন নহে। আর লেখাপড়া শিক্ষা করা শহরে যাইয়া কেরানীগিরি করিবার জন্যই নয়। প্রাচীনকালের কৃষক ও তৎসমশ্রেণীর লোকেরা লেখাপড়া করিত না—কেননা তখনকার অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় তাহাদের বাঁচিয়া থাকিতে উহা অপরিহার্য ছিল না। কিন্তু আজিকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রগত ব্যবস্থায় মানুষ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে কিছুটা পড়িতে ও লিখিতে পারার প্রয়োজন অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। কেবল পড়িতে ও লিখিতে পারাই অপরিহার্য হয় নাই, প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত হওয়ায়, ভোট দিবার অধিকার

থাকায় প্রত্যেকেরই নিজের, দেশের ও রাষ্ট্রের ভালমন্দ বিচার করিবার যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। আজ সবই কাগজে কলমে হয়, তাই পড়িতে ও লিখিতে পারা যেমন দরকার, কিছুটা পরিমাণে কৃষ্টিগত সংস্কার থাকাও প্রয়োজন। শিক্ষা পাইবার বিভিন্ন উপায়ও আছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশে সে সকলেরই অভাব। বর্তমান যুগে ইহার সংগ্রামপূর্ণ কর্মক্ষেত্রে টিকিয়া থাকিতে হইলে অপর লোক, অপর সমাজ, অপর দেশ কি করে না করে তাহাও জানিতে হইবে। তাই কিছু পরিমাণে লেখাপড়া জানা বর্তমানযুগে অপরিহার্য হইয়াছে। পিতৃব্যবসা ছাড়িয়া শহরের সৌখিনতার মধ্যে থাকিয়া পরের চাকুরী করিবার জন্য লেখাপড়া নয়, একথা শিক্ষক ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিবেন।

পূর্বেই বলিয়াছি শিক্ষাদানের ও অন্য যে কোন বিষয়ে সর্বদা নূতন জ্ঞান আহরণ করিয়া শিক্ষার্থীকে দিতে হইবে। নূতন নূতন জ্ঞান আহরণ করিবার জন্য নিজেকে সর্বদা প্রস্তুত রাখিতে হয়। নূতন নূতন গবেষণায় শিক্ষাদান বিষয়ে নূতন কি কথা কে বলিল, সর্বদা অবহিত হইয়া শিক্ষককে উহা গ্রহণ করিতে হয়। অনেকে পুরাতনকে সহজে ছাড়িতে চান না। উহা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইলেও তাঁহাদের পক্ষে উহা পরিত্যাগ করা মুশকিল হইয়া পড়ে। অনেকে এমন বলেন—আমাদের সময়ে আমাদের শিক্ষক মহাশয় এইরূপই বলিতেন। কিন্তু বাহিরের আবেষ্টনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন যে পুরাতনকে ছাপাইয়া চলিতেছে—একথা মনে রাখিতেই হইবে। পূর্বে ভূগোল পাঠ বলিতে কতকগুলি নদী সমুদ্র ও

স্থানের নাম মুখস্থ করা বুঝাইত, কিন্তু আজ ভূগোলপাঠ বলিতে 'The study of mankind in relation to the earth' বুঝা যাইতেছে। অতএব পূর্বের ধারণা বদলাইয়া নূতনকে লইতে হইবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাতের কাজ একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার। তাই প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষককে এবিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে হইবে। নিজের হাতে কাজ না জানা থাকিলে ছাত্রদের শিক্ষাদান দূরের কথা, পরিচালনা করাও বিশেষ অসুবিধাজনক হইবে। তাই অন্ততঃ আমাদের দেশে গ্রামে অল্প খরচে প্রয়োজনীয় যে সকল হাতের কাজ করা যায়, সেগুলি প্রত্যেককে জানিতে হইবে।

শিশুদের শিক্ষায় শিক্ষক অপেক্ষা শিক্ষয়িত্রীর স্থান উচ্চে। মাতৃত্বের আবহাওয়াতেই শিশু প্রকৃত শিক্ষা পাইতে পারে। মাতৃসদৃশ শিক্ষয়িত্রীগণ সহজে এবং সুষ্ঠুভাবে শিশুদিগকে পরিচালনা করিতে পারিবেন, শিক্ষকগণ একদিক দিয়া সে সুযোগে বঞ্চিত। শিশু প্রাণ-প্রধান, বুদ্ধি-প্রধান নহে। মাতৃজাতির কাছে তাহারা যে প্রাণস্পর্শ পায়, সেই স্পর্শই শিক্ষাকে সুগম করে। পুরুষের বুদ্ধির তীক্ষ্নতা শিশুর প্রয়োজন নাই। ইহাই সাধারণ নিয়ম। এবং পৃথিবীর সকল দেশেই প্রাথমিক শিক্ষার ভার নারীজাতীর উপর। সেখানে কেবল শহরের বিদ্যালয়ে নহে, গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতেও শিক্ষয়িত্রী রহিয়াছেন। প্রফেসর কার্ণে-এর গণনা অনুসারে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গ্রামগুলিতে শতকরা ৮৭.৮ এবং শহরগুলিতে

শতকরা ৯৫·৭ জন শিক্ষয়িত্রী রহিয়াছেন। সে তুলনায় আমাদের দেশে কয়জন নারী শিক্ষাদানকার্যে নিযুক্ত আছেন? আমাদের এ বিষয়ে অবহিত হইতে হয়। নানা কারণে আজকাল অনেক মেয়েই বাহিরের নানা কাজে যোগ দিতেছেন। সে ক্ষেত্রে শিক্ষয়িত্রীর কাজ শিক্ষকেরা করিবেন—ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষয়িত্রী নিয়োগের দিকে সচেষ্ট হইতে হয়। মেয়েদের জন্য ট্রেণিং দেওয়ার ব্যবস্থাও একেবারেই নগণ্য। প্রাথমিক শিক্ষয়িত্রীদের ট্রেণিএর জন্য বাংলাদেশে মাত্র দুই তিনটি কেন্দ্র আছে। শিক্ষকদের ট্রেণিং দিবার জন্য যেমন পাঁচবৎসরের জন্য কতকগুলি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে, সেইরূপ একটা কিছু ব্যবস্থা মেয়েদের জন্যও না করিলে ট্রেণিং প্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রীর সমস্যার সমাধান কি করিয়া হইবে? শিক্ষয়িত্রীগণ যদি শিশুদের ভার গ্রহণ করেন তবে তাহাই অপচয় ও অচল অবস্থা নিবারণের একটা পথ হইবে।

দেশের জীবনে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রয়োজনীয়তা যতখানি তাহাদের বেতন সেই অনুপাতে একেবারেই নগন্য বলিতে হইবে। শিক্ষকদের যোগ্যতা বাড়াইতে হইলে এবিষয়ে কর্তৃপক্ষের অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পরিবার লইয়া জীবন যাপন করিতে হইলে যাহা প্রয়োজন তাহাও তাঁহাকে দেওয়া না হইলে তাঁহার নিকট হইতে কিছু আশা করা চলে না। বর্তমানযুগে কোন দেশেই শিক্ষকের বেতন এত স্বল্প নহে। শিক্ষকের বেতন লইয়া কাউন্সিলের সভ্যগণের নিকট মন্ত্রীদের পরাজয়ের কথাও অন্যদেশে গল্পমাত্র নহে।

কিন্তু অন্য দেশের সহিত আমাদের তুলনা কিসে? ইংলণ্ডে যুদ্ধের পূর্বে প্রতিজনের শিক্ষার বাৎসরিক ব্যয় ছিল ৩৩৲ টাকা; সেই সময়ে আমাদের দেশে প্রতিজনের শিক্ষার বাৎসরিক ব্যয় ॥০ আনা মাত্র। তাহাদের সহিত আমাদের তুলনা কিসের? কর্তৃপক্ষের যাহা করিবার তাহা তাঁহারা করিবেন, কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবার আর আমাদের সময় নাই। আমাদের প্রয়োজন কি, কিভাবে তাহা মিটান যাইতে পারে ইহা আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া কাজে অগ্রসর হইতে হইবে, নিজেদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পরের অপেক্ষায় শুধু বসিয়া থাকিলে কোনদিনই প্রয়োজন মিটিবে না। আমরা নিজেরা অগ্রসর হইয়া চলিলে কর্তৃপক্ষও উদাসীন থাকিতে পারিবেন না। নয়তো এই ॥০ আনা চিরদিনই ॥০ আনা থাকিয়া যাইবে কিংবা আরও কমিয়া আসিবে।

আমাদের এ-কথা ভুলিলে চলিবেই না যে আমাদের শিক্ষকদের দুরবস্থা আমাদিগকেই দূর করিতে হইবে। আজ যদি নিজেদের সুখ সুবিধা অনেকাংশে পরিত্যাগ করিয়া আজিকার ছাত্রদলকে মানুষ করিয়া যাইতে পারি তবে তাহারা একদিন সৌভাগ্যের মুখ দেখিবে। নিজেদের প্রয়োজনটুকু শিক্ষকতা করিয়া মিলে না বলিয়া শিক্ষকদের অন্যান্যদিকে মন দিতে হয়—একথা মানিয়া লইয়াও বলিতে পারা যায় যে আজ যাহারা ছাত্রসমাজ, আমাদের সেই সন্তানদের যদি আমাদের মত দুঃখের দিন হইতে রক্ষা করিতে চাই তবে শিক্ষকতা কার্যে ক্ষতি না হয় এমন ভাবেই আমাদিগকে পেটের সংস্থানের জন্য অন্য কিছু করিতে

হইবে। মানুষ কেবল বর্তমান লইয়া বাঁচে না, ভবিষ্যতে যাহারা আসিবে তাহাদের মধ্যেও যে আমরা বাঁচিব। পৃথিবীর যে কোন দেশে নিপীড়িত দেশকে দুরবস্থার মোচনকার্যে নীরব সেবা করিয়া আসিয়াছেন এই শিক্ষক সম্প্রদায়। রাশিয়ার শিক্ষকগণ এবিষয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দেশের ঘুণে-ধরা চিত্ত-বৃত্তিকে পরিবর্তিত করিবার কাজে সকল দেশে সকল যুগে প্রধান কাজ করিয়া আসিয়াছেন দেশে জ্ঞানদানকারী এই শিক্ষক সম্প্রদায়। তাই শিক্ষকের দায়িত্ব প্রচুর—সেই দায়িত্বের গৌরবে বুক ভরিয়া রাখিয়াই তো কর্মে অগ্রসর হওয়া চলে। দুঃখের দিনে কেহ সাহায্য করিবে না, বরং গালি দিবে, আমাদের কাজে বাধা দিবে, আজিকার কর্মের আজ কোন পুরস্কার হয়তো—হয়তো কেন এ দুর্ভাগা দেশে নিশ্চয়ই—পাওয়া যাইবে না। কেবল আমাদের এই সেবাধর্মের ফলে যদি দেশের অবস্থা ফিরে তবে সেইদিন সেই ফলভোগীরা আমাদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে—এই তো পুরস্কার, এই তো তৃপ্তি। তাই কাহারও ভরসায় না থাকিয়া সমগ্র দেশকে সম্মুখে রাখিয়া নিজেদের বর্তমান প্রয়োজনকেই একমাত্র মনে না করিয়া আমাদের শিক্ষকদের অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে এবং তাহা হইলেই তাহা-দের বর্তমান বেতন বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা থাকিবে। নয়তো বেতন বাড়াইলে কাজ করিব এই ভরসায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে কোনদিন বেতনও যেমন বাড়িবে না, দেশেরও কোন উন্নতি হইবে না। শিক্ষকতা বৃত্তি শিক্ষকদের জীবিকার্জনের যেমন একটা পথ, তেমন ইহা দেশ সমাজ ও রাষ্ট্রকে সেবা করিবার পথও বটে

একথা মনে রাখিতেই হইবে। আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় চেতনা জনসাধারণের কাছে অস্পষ্ট, অর্থহীন। কিন্তু অন্যান্য দেশে প্রত্যেক লোক জানে সে তাহার কর্মের দ্বারা রাষ্ট্রের তথা দেশের ও সমাজের সেবা করিতেছে। আজ আমরা জীবন সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন ধারণা হারাইয়া ফেলিয়াছি, আধুনিক জগতের প্রত্যেকদেশে যাহা সহজ ও সত্য সেই রাষ্ট্রীয় চেতনাও লাভ করি নাই। তাই যেখানে অন্যান্যদেশের লোক নিজের ও রাষ্ট্রের উভয়ের সেবা করে, আমাদের সেখানে সকল কর্ম কেবল নিজের জন্যই করা হয়—ইহাতেই আমাদের জীবনের দৈন্য ঘোচে না। প্রত্যেক তাহার কর্ম টুকু করে কিনা দেখিবার জন্য সেখানে রাষ্ট্র রহিয়াছে, আমাদের তাহা নাই—অতএব আমাদের দায়িত্ব নিজেদেরই লইতে হইবে। তাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে শিক্ষকতা যেমন আমাদের জীবনের একটা কর্ম তেমনি ইহা রাষ্ট্রের প্রতি, দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি সেবাও বটে। তবেই আমাদের শিক্ষকতার কার্য সার্থক ও সুষ্ঠু হইবে।

গ্রাম্য শিশুর বুদ্ধির প্রকৃত অবস্থা।

শিক্ষার চারিটি দিক আছে—দেশ-সমাজ-জাতির আবেষ্টন, শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাসূচী, শিক্ষক এবং শিশু। অতীতে ইহার এক একটি দিককে এক একসময়ে অন্যগুলি অপেক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করা হইয়াছিল এবং কিছুদিনের জন্য শিক্ষা-ক্ষেত্রে এক একটি বিষয় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়া-ছিল। জাতি ও সমাজের কোন্ অবস্থায় কোন্ দিকটি কেন উন্নতশীর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল আমাদের তাহা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। পূর্বে শিক্ষনীয় সকল উপযুক্ত বিষয়ই শিশুকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা হইত। সকলকেই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু শিশুতে শিশুতে যে রুচি ও সামর্থের ভেদ আছে তাহা জানা ছিল না। কখনও বা শিক্ষকের সুবিধা অসুবিধা ও বুদ্ধি বিবেচনাই শিক্ষার গতি নির্ধারণ করিত। কখনও বা কাগজে মুদ্রিত সব কিছুই পাঠ্য বলিয়া শিক্ষক ও ছাত্র মনে করিতেন। আজ মানব সভ্যতার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা শিশুকেই প্রধান আসন দিয়াছে। একটি জীবন্ত শিশুই তাহাকে কি শিক্ষা দিতে হইবে, কিভাবে শিক্ষা দিতে হইবে তাহা স্থির করিয়া দেয়। অবশ্য শিশু যেমন শিক্ষার বিষয়, পদ্ধতি স্থির করে, শিক্ষক যেমন শিশুকে কেন্দ্র করিয়াই পাঠদান কার্য চালাইয়া থাকেন, তেমনি শিশু কি হইবে, কি হওয়া উচিত, তাহা তাহার দেশ-সমাজ-জাতির

আবেষ্টন অনেকখানিই স্থির করিয়া দেয়। স্থির করিয়া দিলেও শিক্ষা কখন কিভাবে শিশুকে দিতে হইবে, তাহা শিশুর জীবনের গতির উপরই নির্ভর করে। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে সকলকে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায় না; সকলকে একই পদ্ধতিতেও শিক্ষা দেওয়া যায় না। যাহা তাহার সামর্থ্যের বাহিরে, তাহা তাহাকে জানাইতে যাওয়া, অবৈজ্ঞানিক এবং তাহাতে তাহার ক্ষতি ছাড়া কোন লাভ হয়না। আবার শিশুর শ্রান্ত ও অসুস্থ অবস্থায় শিক্ষা দিতে যাওয়া অর্থহীন, কেননা সে তখন কিছুই গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু পড়িবার সময় পড়িতেই হইবে ইহাই পূর্বে নিয়ম ছিল। পূর্বে শিশুর কোন পৃথক ব্যক্তিত্ব বা স্বাধীনতা স্বীকৃত হইত না। মনে করা হইত যখন সে বড় হইবে, তখনই তাহার ভালমন্দের বিচার করা যাইবে। কিন্তু আজ অভিজ্ঞতায় শিশুর ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক বয়স্কলোকের মত আজ প্রতি শিশুই একটি ব্যক্তি। শিশুকে একটি পূর্ণ মানুষ করিয়া তুলিতে তাহার শৈশবাবস্থা হইতেই তাহার প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন অর্থাৎ শৈশবই যে পরবর্তী জীবনকে সৃষ্টি করে —একথা বিজ্ঞান আজ আমাদিগকে ভালভাবেই জানাইয়া দিয়াছে। এই সমস্ত কারণেই বর্তমান যুগকে শিশুর যুগ বলা হয়। পৃথিবীর সকল দেশেই আজ শিশু সম্বন্ধে এই সকল নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। তাই তাহারা দেশ-সমাজ-জাতির বৃহত্তর আবেষ্টনের মধ্যে শিশুকে স্থাপন করিয়া তাহার ভালমন্দ লাগা,

তাহার দৈহিক ও মানসিক শক্তিসামর্থকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষার যাবতীয় কার্য চালাইতেছে। শিশুকে একটি পূর্ণমানব করিয়া তুলিবার জন্য তাহাকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিষয়ীভূত করিয়াছে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সকল প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, ভাব-অভাবের হিসাব লইতেছে এবং সেই সব হিসাবের উপরেই তাহার শিক্ষানীতি গঠন করেতেছে।

কিন্তু অনেক একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপারের মতই এই শিশুশিক্ষা ব্যাপারেও আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে কিছুই করা হয় নাই বলিলেও অতুক্তি হয় না। কিন্তু আর দেরী করিবার সময় নাই। আজ যাহা আছে তাহা কেবল যে প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য তাহাই নহে, তাহা লোকদেখান কয়েকটি বিদেশীনীতি রোপন করা মাত্র, বিশেষ কোন ফলই আজ পর্যন্ত উহা হইতে পাওয়া যায় নাই। শিশুর প্রয়োজন সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক ও ব্যাপক প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত করা হয় নাই।

আমাদের দেশের শতকরা ৯০জন লোক গ্রামে বাস করে অতএব গ্রামের উন্নতিই দেশের উন্নতির সূচনা করিবে; সেইজন্য এই সব গ্রামের ছেলেদের বিশ্লেষণ করিয়া* তাহাদের বুদ্ধি কতটুকু, তাহাদের মানসিক বয়স কত, তাহাদের বৈশিষ্ট্য কি তাহা আমাদের জানিতে হইবে। তাহা জানা থাকিলেই শুধু তাহাদিগকে কিভাবে শিক্ষা দিতে হইবে তাহা বুঝা যাইবে। অতএব গ্রামের ছেলের বৈশিষ্ট্য জানিতে হইলে আমাদের গ্রামের ছেলেদের বুদ্ধির বয়স বাহির করা বিশেষ প্রয়োজন।

গ্রামের শিশুর বৈশিষ্ট্যের দুইটি দিক আছে—একটি ব্যক্তিগত অপরটি সমাজের দিক হইতে। সংখ্যা হিসাবে শহরের ছাত্র অপেক্ষা গ্রামের ছাত্র যে বেশি তাহা সহজেই বুঝা যায়। গত সেন্সাস হইতে দেখা যায় বাংলাদেশে গ্রামের ছাত্রের সংখ্যা শহরের ছাত্রের ৮গুণ। এইদিক দিয়া শহরের ছাত্র অপেক্ষা গ্রামের ছাত্র জাতীয়জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহা ব্যতীত গ্রামের ছাত্র অল্প বয়স হইতেই মাঠে ঘাটে ও সর্বত্রই পিতামাতার কাজে সাহায্য করিয়া পরোক্ষে দেশের সম্পদ উৎপাদনে সাহায্য করিয়া থাকে। শহরের ছাত্র সাধারণতঃ আসে মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং উচ্চশ্রেণীর গৃহ হইতে। ইহারা এই বয়সে দেশের সম্পদ উৎপাদন, রক্ষণ বা বৃদ্ধির কাজে কোনও সাহায্য করে না বলাও চলে। গ্রামের শিশুকে শিক্ষাদানকালে এবং তাহাদের বুদ্ধির প্রকৃত অবস্থা কি তাহা বাহির করিবার কালেও ঐ কথাটা মনে রাখিতে হইবে।

গ্রামের শিশুর বুদ্ধির তত্ত্ব লইতে গেলে একটা প্রশ্ন মনে আসে যে গ্রামের শিশুর বুদ্ধি শহরের শিশু হইতে কম, না বেশি, না সমান। আমাদের দেশে এইরূপ প্রশ্ন তুলিয়া তাহার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা এ যাবৎ হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। কিন্তু অন্যান্য দেশে এ বিষয়ে অনেক গবেষণা হইয়াছে। তবে নিশ্চয়াত্মক কোন একটি সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় নাই। কোথাও কোথাও দেখা গিয়াছে যে শহরের শিশুর বুদ্ধি গ্রামের শিশু হইতে অল্প কিছু বেশি। Iowa Welfare Research

Stationও ঠিক এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে[১]। তাহারা আরও বলে যে গ্রাম্য শিশু শিক্ষার প্রারম্ভে শহরের শিশু হইতে বুদ্ধিতে ক্ষীণ থাকে না। অর্থাৎ গ্রাম্য শিশুর বুদ্ধির ক্ষীণত্ব প্রকৃতিগত নয়, উহা শিক্ষাগত; শিক্ষার আবেষ্টনই বুদ্ধির গতি নির্ধারণ করে। এ কথা মানিয়া লইলে শিক্ষাসূচী প্রস্তুত করার সময় ইহা মনে রাখিতে

অন্যান্য যেসব স্থানে এবিষয়ে গবেষণা হইয়াছে, সেই সকল স্থানেও Iowaর অনুরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে। তাহাদেরও মতে গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার্থী হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী পর্যন্ত সকলেই শহরের ঐ জাতীয় ছাত্র হইতে বুদ্ধিতে ক্ষীণ। আমেরিকার মিসিসিপিতে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে দারিদ্রের কষাঘাত শিশুদের বুদ্ধিকে হীনবল করিয়া দেয়। দরিদ্র শিশুদের বুদ্ধি ধনী শিশুর বুদ্ধি হইতে কম। দারিদ্র বুদ্ধির ক্রমবর্ধনের অন্তরায়। এই সকল গবেষণাগুলি প্রমাণ করিয়াছে যে শহরের শিশু হইতে গ্রামের শিশুর মানসিক বয়সের ব্যবধান গড়ে তিনমাস হইতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর ছয়মাস পর্যন্ত। কেবল শিশু নয়, বয়স্ক লোকের পক্ষেও একথা সত্য। শহরের সাধারণ লোক হইতে গ্রামের কৃষকের বুদ্ধিও কম।

উপরের কথাগুলি আলোচনা করিলে কি মনে হয়? প্রথমেই প্রশ্ন উঠে বুদ্ধির সংজ্ঞা কি? শিক্ষা ও আবেষ্টনের

(১) "Iowa Welfare Research Station Report"—Nation Schools. Vol 7, No. 6—1931. Page 76.

বিভিন্নতার দরুণ শহরের লোক ও শিশু এক বিষয়ে অভিজ্ঞ, গ্রামের লোক ও শিশু বিষয়ান্তরে অভিজ্ঞ। যে পরীক্ষাদ্বারা কোন এক বিষয়ে বুদ্ধির পরিমাপ সম্ভব হয়, সেই পরীক্ষাদ্বারা অন্যক্ষেত্রে সেই বিষয়ে বুদ্ধির মাপ সম্ভব হয় কি? যে শিশু ভাষায় অপটু বলিয়া কতকবিষয়ে ব্যর্থ হয়, সেই শিশুই হাতের কাজ বা অন্যান্য অনেক কাজেই দক্ষতা দেখাইতে পারে। এমনও হয় যে ভাষার দক্ষতা না থাকাতে সাহিত্যে উত্তীর্ণ হইতে পারে না, কিন্তু সে-ই গণিতে সর্বোচ্চস্থান অধিকার করে। শিক্ষা ও আবেষ্টনের বিভিন্নতার দরুণ বুদ্ধির রূপও ভিন্ন।* ইহা ব্যতীত যে ধরণের বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার প্রশ্ন গ্রামের শিশুদের নিকট উপস্থিত করা হয় তাহাদ্বারা তাহাদের সামর্থ বিচার সঙ্গত হয় না। শহরের বিদ্যালয়ের ছেলেদের আবেষ্টন ও শিক্ষা গ্রাম হইতে ভিন্ন। তাহারা যে সব বিষয় জানে বা বুঝে, গ্রামের ছেলেরা তাহা জানে না বা বুঝে না। শহরের শিক্ষার মাপকাঠীতে ও শহরের ভাষায় প্রস্তুত প্রশ্নগুলি গ্রামের ছেলেদের নিকট ধরিলে শিক্ষা ও আবেষ্টনের ভিন্নতায় তাহারা উহার উত্তর দিতে পারিবে না, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। তবে বলিতে হয় যে শহরের মানদণ্ডে শিক্ষা ও বুদ্ধিতে তাহারা হীন। কিন্তু একের বুদ্ধিমাপক প্রশ্নদ্বারা ভিন্ন আবেষ্টনের অপরের বুদ্ধির বিচার সঙ্গত ও সম্ভব কি? তাছাড়া শিক্ষা ও আবেষ্টনের সম্পর্কে

* এইটুকুই শুধু বলা যায় যে কোন এক শিশুর কোন বিষয়ে বুদ্ধি আছে, অথচ অন্য বিষয়ে নাই; কিন্তু তাহাকে একেবারে বুদ্ধিহীন বলা যায় না। গ্রামের ছেলে এমন অনেক বিষয়ে বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে, যাহা শহরের ছেলে জানে না।

আরও একটি কথা বলা যায়—পরীক্ষাদ্বারা প্রমানিত হইয়াছে যে পিতা বা অভিভাবকের বৃত্তির সঙ্গে শিশুর বুদ্ধির একটা সম্বন্ধ আছে। দক্ষ ও উদ্যমশীল ব্যবসায়ীর শিশু পরাধীন শ্রমিকের শিশু অপেক্ষা বুদ্ধিমান।

অতএব গ্রামের শিশুর সঙ্গে শহরের শিশুর বুদ্ধির যে পার্থক্য দেখা গিয়াছে, তাহা উপরের কারণগুলির জন্যই সম্ভব হইয়াছে। প্রশ্নপত্রগুলি তৈয়ার করিতে যদি আমরা চারিদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া প্রস্তুত করি এবং নানা বিষয়ে যদি সাবধানতা অবলম্বন করি তবে আমাদের মনে হয় গ্রামের শিশুদের বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার ফল আরও সন্তোষজনক হইবে। তাহাদের আবেষ্টন ও জন্মগত শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রশ্ন প্রস্তুত করিতে হইবে। এইভাবে একটি প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা যত শীঘ্র সম্ভব হয়, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার প্রচলন আমাদের দেশে এখনও ব্যাপকভাবে হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ট্রেণিং কেন্দ্রগুলিতে বুদ্ধি মাপ করিবার শিক্ষা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাস্তবিকপক্ষে ব্যবহৃত হয় না। ট্রেণিং কেন্দ্রগুলিতে সাধারণতঃ বিনেট সাইমন স্কেলের ষ্টানফোর্ড রিভিসন অনুসরণ করা হয়। এই স্কেলটির বাংলা অনুবাদ করিয়া দুই একস্থানে গবেষণা কার্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ঠিক ইহা যে গ্রামের শিশুদের পক্ষে উপযোগী নয়, তাহা বলা বাহুল্য। দুই একটি উদাহরণ লওয়া যাক্। ষষ্ঠ বর্ষের চতুর্থ প্রশ্নে আছে "তুমি কোথাও যাবে, ষ্টেশনে গিয়ে দেখতে পেলে গাড়ী

ছেড়ে দিয়েছে তখন তোমার কি করা উচিত? প্রশ্নটি গ্রামের উপযোগী নহে;—কয়টি ৬ বৎসর বয়স্ক গ্রাম্য শিশু ষ্টেশন দেখিয়াছে? বিনেট সাইমন স্কেলে বলা আছে যে 'রেল ষ্টেশন' না থাকিলে 'ষ্টীমার ষ্টেশন' বলা যাইতে পারিবে। কিন্তু 'ষ্টীমার ষ্টেশনের' অভাব কি 'রেলষ্টেশন' অপেক্ষাও বেশি নয়?

সপ্তম বর্ষের দ্বিতীয় প্রশ্নে শিশুকে একটি ছবি দেখাইয়া সেটা বিবৃত করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু গ্রামের ছেলে ছবি দেখিতে অভ্যস্ত নয়, দেখে নাই বলিলেও চলে; অথচ সাধারণ ছবি দূরের কথা, সিনেমার ছবিও শহরের শিশুর নিকট অপরিচিত নয়। ছবি দেখিয়া অভ্যাস থাকিলে পর্যবেক্ষণ শক্তি ও কল্পনা শক্তি বাড়ে, বর্ণনা করিতে, সিদ্ধান্ত করিতে শেখে, বুদ্ধি খাটাইয়া একটার সঙ্গে আর একটা বস্তু মিলাইয়া লইতে পারে। যে একেবারেই দেখিয়া অভ্যস্ত নয় তাহার কাছে ছবি সম্বন্ধে এই গুণগুলি অনুপস্থিত। হঠাৎ তাহার নিকট ছবি ধরিলে সে বুঝিতে পারিবে কেন? আমাদের দেশের গ্রামের পক্ষে অনুপযুক্ত এইরূপ আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

বিনেট সাইমনের প্রশ্ন যে আমাদের গ্রামের ছেলেদের পক্ষে উপযুক্ত নয়, তাহার আরও একটা কারণ আছে। অন্য দেশের শিশুরা ২।৩ বৎসর বয়স হইতেই নার্সারি বিদ্যালয়ে যায়, সেখানে কিনডারগারটেন প্রণালীমতে নানারূপ ছবি, নানা রং, মানুষের জীবনে প্রয়োজনে আসে কিংবা না আসে এমন বহুদ্রব্য দেখে, নিজহাতে ধরিয়া সেগুলি সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া

রাখে। আর আমাদের দেশে "নার্সারী স্কুল" বস্তুটি অনেক পাশ করা লোকেও বুঝিয়া উঠিতে পারে না। গ্রামের শিশুরা ছয় বৎসরের আগে বিদ্যালয়ে যায় না; আগেও কোন শৃঙ্খলাপূর্ণ ট্রেণিং পায় না, বিদ্যালয়েও শুধু বই হাতে কাঠের বেঞ্চিতে মুখে আঙ্গুল দিয়া বসিয়া থাকে। যে প্রশ্ন শহরের শিশুর কাছে সহজ বলিয়াই মনে হইতেছে, গ্রাম্য শিশুর দিক হইতে তাহা মোটেই সহজ নয়। অতএব সেরূপ প্রশ্নের সাহায্যে তাহার বুদ্ধির মাপ করা যাইতে পারে কিরূপে?

আর শিশুর আবেষ্টন যদি শিশুর শিক্ষা ব্যাপারে মস্ত বড় কথা বলিয়া ধরিয়া লই, তবে ঐ প্রশ্ন যে আমাদের গ্রাম্য ছেলেদের জন্য নহে, এ বিষয়ে আর প্রশ্ন উঠিতে পারে না। বিনেট সাইমন তাহাদের ছেলেদের আবেষ্টন লক্ষ্য করিয়াই প্রশ্ন পত্র প্রস্তুত করিয়াছিল, অতএব আমাদের গ্রাম্য ছেলেদের আবেষ্টন লক্ষ্য করিয়াই আমাদিগকে প্রশ্ন পত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। এইভাবে উপযুক্ততার কথা ছাড়া এই প্রশ্নগুলি বাংলাদেশের শিশুর পক্ষে কতটা 'আদর্শ' তাহাও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।

আমাদের গ্রামের প্রাথমিক শিশুদের জন্য বুদ্ধিমাপক প্রশ্ন এইভাবে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। প্রথমে জটিলতাহীন কতকগুলি অতি সাধারণ প্রশ্ন প্রস্তুত করিতে হইবে। এমনভাবে প্রশ্নগুলি করিতে হইবে যেন সেগুলির উত্তরের জন্য বইর কোন জ্ঞানের প্রয়োজন না হয়। কেননা গ্রামের ছেলেদের পুঁথিগত বিদ্যা নাই। ঐ প্রশ্নগুলি শিশুর আবেষ্টনানুযায়ী

হইতে হইবে। যে বয়সের বুদ্ধি বাহির করিতে চাই সেই বয়সের সমগ্র বাঙ্গালা দেশের অত্যন্ত অধিক সংখ্যক শিশু যে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তাহাই হইবে ঐ বয়সের শিশুর বুদ্ধিমাপক প্রশ্ন। বাঙ্গালাদেশের এক ট্রেণিং-স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয় এই বিনেট সাইমন স্কেলের ষ্টানফোর্ড পরিবর্তিত প্রশ্নগুলির বঙ্গানুবাদের সাহায্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের মানসিক বয়স, বুদ্ধির বয়স ও আই, কিউ বাহির করিয়াছেন। ২০টি শিশুর মধ্যে মাত্র দুইজনের আই কিউ ১০০ এবং ৪ জনের ৯০ হইতে ১০০র মধ্যে। আর সকলেরই ৯০র নীচে, অর্থাৎ বাকি সকলে অল্পমেধা সম্পন্ন। একটি দৃষ্টান্ত হইতে বাংলাদেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ফলও এইরূপ হইবে বলিয়া বলা যায় না বটে, তবু একটি বিদ্যালয়েই শতকরা ৩৩জন সাধারণবুদ্ধি সম্পন্ন ছাত্র থাকিলে সমস্ত বাংলাদেশে সেই পরীক্ষা অনুসারে ৩৫ হইতে ৪৫ জনের বেশি পাওয়া যাইবে না ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। কেননা একটি বিদ্যালয়ের পক্ষে শিক্ষা ও আবেষ্টনগত যে সকল কথা সত্য বাংলাদেশের অপর সকল বিদ্যালয়গুলির পক্ষেও সেকথা অনেকখানিই সত্য, ইহা বলিলে ভুল বলা হয় না। কেননা আবহাওয়া সকল স্থানেই সমান। কিন্তু বাংলাদেশে সাধারণ মেধা সম্পন্ন শিশু শতকরা মাত্র ৬০জন ইহা ধরিয়া লইলেও এই হিসাবে শতকরা ১৫ হইতে ২৫ জন কম হয়। বাংলাদেশের শতকরা ৫৫ হইতে ৬৫জন শিশুই কি সাধারণের বাহিরে? বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাংলাদেশের উচ্চমেধা

ও অসাধারণ মেধার শিশুসংখ্যা জানা যায় নাই। অন্যান্য দেশের শতকরা হিসাব হইতে যদি আমরা একটা হিসাব করি তবে শতকরা অন্ততঃ ৬জন অসাধারণমেধা ছাত্র পাওয়া যাইবে। অতএব সাধারণ ও অসাধারণে মিলিয়া যেখানে শতকরা ৬৬জন হইবে সেখানে হইতেছে মোটে ৩৫+৬ হইতে ৪৫+৬ জন। অতএব এই বিনেট সাইমনের পরীক্ষা হইতে দুইটি কথা অনুমান করা যায়—প্রথম হইতেছে বাংলাদেশের ছাত্রদের মেধা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা কম এবং দ্বিতীয়তঃ বিনেট সাইমনের ষ্টানফোর্ড পরিবর্তিত স্কেলের সাহায্যে বুদ্ধির পরীক্ষা এই দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয় না। প্রথম সিদ্ধান্তটিকে আমরা প্রকৃতিগত নিয়ম অনুসারেই বাদ দিতে পারি, কেননা প্রকৃতি-গত নিয়মই এই যে অর্দ্ধেকের বেশি সংখ্যা সাধারণের মধ্যে পড়ে, বাকি অর্দ্ধেকের কম সাধারণের বাহিরে। তাই বিনেট সাইমনের ষ্টানফোর্ড পরিবর্তিত স্কেল যে বাংলাদেশের পক্ষে উপযুক্ত নয়, ইহাই স্পষ্টতর হইয়া উঠে। এই প্রশ্নগুলি নজরে রাখিয়া বাংলাদেশের আদর্শ, আবেষ্টন ও শিক্ষানুযায়ী প্রশ্ন প্রস্তুত করিতে হইবে, বিনেট সিমনের ষ্টানফোর্ড পরিবর্তিত প্রশ্নের অনেকগুলি মার্জিত ও পরিবর্তিত করিয়াও লওয়া যাইতে পারে। সেই প্রশ্নপত্র শিশুদের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া উহার ফলাফল বিবেচনা করিয়া তাহার পর সিদ্ধান্তে আসিতে হইবে। বুদ্ধিমাপক প্রশ্ন করিবার সময়, যাহা তাহাদের পরিচিত জগৎ, যে জ্ঞান তাহাদের আয়ত্ত, সেই পরিচিত জগৎ হইতে, সেই আয়ত্তাধীন জ্ঞান হইতে শিশুর বুদ্ধি মাপ করিতে হইবে।

যাহা সে জানে না, যাহা আমাদের গ্রামের দরিদ্র ও নিরক্ষর শিশুদের জানা বা দেখার বাহিরে, তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া বুদ্ধি মাপ করিতে যাওয়া অর্থহীন।

বিনেট সাইমন স্কেল জাতীয় ব্যক্তিগত পরীক্ষা করা অপেক্ষা সমষ্টিগত পরীক্ষা সুবিধাজনক। ব্যক্তিগত পরীক্ষা শিশুর বিশেষ কোন দোষ ত্রুটি কিংবা কোনরূপ অমিতাচারের বিশ্লেষণজন্য ; মনঃসমীক্ষণের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু সমষ্টিগত পরীক্ষা সাধারণ এবং সাধারণের বাহিরে যাহারা তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে শীঘ্র বিভাগ করিতে সাহায্য করে। বাংলাদেশের ছাত্র সংখ্যা অধিক, বিদ্যালয়ের সংখ্যাও কম নহে। প্রথমে সমষ্টিগত পরীক্ষা দ্বারা বিভিন্ন দলে বিভাগ করিয়া তারপর সাধারণের বাহিরের শিশুদের জন্য ব্যক্তিগত পরীক্ষা করিলেই চলে।

দেশের মধ্যে নানা রকমের শিশু আছে—অসাধারণ মেধা, উচ্চ মেধা, সাধারণ মেধা, অল্প মেধা, ক্ষীণ মেধা। কে কোন্ দলভুক্ত, কাহার কি বৈশিষ্ট্য, কাহাকে কিরকমভাবে শিক্ষা দিলে, কাহার সহিত কি রকম ব্যবহার করিলে, উহা তাহার পক্ষে শিক্ষণীয় হয়, সে সহজে সারা দেয়, আনন্দ পায়, এ সকল জানা না থাকিলে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। জানা থাকিলে অনেক সুবিধা হয়। প্রত্যেকটি শিশু এক একটি জীবন্ত প্রাণের টুকরা, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কিছু না কিছু বিভিন্নতা আছে। উচ্চ মেধা, সাধারণ মেধা, ক্ষীণ মেধা সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে এক

একজন শিক্ষকের অধীনে এত অধিকসংখ্যক ছাত্র থাকে যে একজন শিক্ষকের পক্ষে অত সংখ্যক শিশুকে নিপুণভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। শিশু শ্রেণীতে আসে যায়, এইভাবে বৎসর কাটিয়া যায়—তারপরে একদল পাশ করে, একদল করে না। কিন্তু যদি বুদ্ধিমাপক প্রশ্নপত্র থাকিত, শিক্ষক যদি প্রথম হইতেই জানিতেন কাহার কতটুকু বুদ্ধি, তবে ইহারই মধ্যে কাহাকে কতটুকু কিরকমভাবে বলিলে কার্য সিদ্ধ হইতে পারে, সে বিষয়ে শিক্ষক যথাসম্ভব বুঝিতে পারিতেন। কোন শিশু এমন আছে যাহার পক্ষে পড়া বুঝিতে পারা কঠিন নয় কিন্তু স্বভাবতঃ এত লাজুক এবং ভীরু প্রকৃতির যে দশজনের সম্মুখে কোনদিন মুখ ফুটিয়া পড়া বলিতে পারে না। এমন হইতে পারে যে এই বৈশিষ্ট্যও শিক্ষক যেমন জানিতেন না, তাহার যে বুদ্ধি আছে তাহাও জানিতেন না। ইহার ফলে সে হয়তো কোনদিন পাশ করিতে পারিল না। তাহার মধ্যে যে গুণটা ছিল তাহাও যেমন প্রকাশ হইতে পারিল না, আবার যে দোষটা ছিল, তাহাও বিদূরিত হইতে পারিল না। আবার এমন শিশু আছে যাহাদের পড়া বুঝিতে কিছু সময় নেয়। তাই তাহারা প্রথম ঘণ্টার পড়া চট্ করিয়া ধরিতে পারে না বলিয়া সেই বিষয়ে কাঁচা হয়। দ্বিতীয় ঘণ্টায় তাহাদের মনোযোগ ঠিকমত হয় বলিয়া সেই ঘণ্টার পড়ায় সে বেশ ভাল হয়। কিন্তু শিক্ষক যদি তাহার এই বৈশিষ্ট্যটুকু না জানেন তবে প্রথমঘণ্টায় যদি অঙ্ক হয় তবে তাঁহাকে স্থির করিতে হইবে যে সেই ছেলেটির অঙ্কে মাথা

নাই। কিন্তু অঙ্ক দ্বিতীয় ঘণ্টায় থাকিলে হয়তো সে তাহাতেও ভাল করিতে পারিত। আবার যে শিশু উচ্চ বা অসাধারণ মেধাসম্পন্ন তাহাকে শ্রেণীর সকলের সঙ্গে পড়াইলে তাহার শক্তির অপচয় হয়। সাধারণের বাহিরে ছাত্ররা কিরূপ শিক্ষা দাবি করে তাহা আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা না করিতে পারিলে কে কোন বিভাগে পড়িবে তাহাই স্থির করা যাইবে না। অতএব শিক্ষার খুব বেশি ক্ষতি হয়। নানারকমের শিশুকে পড়াইবার জন্য আজ পৃথিবীর সকল দেশেই নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয়। আমাদের দেশে সে সব অসম্ভব হইল কেন? কিন্তু আমাদের একে একে সবই করিতে হইবে। যন্ত্রপাতি পরে হউক, বুদ্ধির হিসাব জানা থাকিলেও পড়ানর কাজে অনেক সাহায্য হইত। শ্রেণীর প্রত্যেক ছেলের বুদ্ধির হিসাব লইতে যেমন বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা করিতে হইবে, বিদ্যালয়ে ভর্তি করার সময়ও প্রত্যেককে এইভাবে পরীক্ষা করিয়া ভর্তি করা দরকার। তাহা হইলে পরের কাজও সহজ হইবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ট্রেণিং কেন্দ্রগুলির অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও প্রধান শিক্ষকগণ মিলিয়া যদি একটা বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিতেন এবং তাহা বিভিন্নস্থানে পরীক্ষা করিয়া উহার কার্যকারিতা বিচার করিয়া লইতেন, তবে বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি শিক্ষার দিকে মস্ত বড় একটা সাহায্য পাইত। সেই পরীক্ষিত প্রশ্নপত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পাঠাইয়া দিলে অল্পশিক্ষিত শিক্ষকদের মস্তবড় উপকার হইত।

মাঝে মাঝে স্কুলবোর্ড তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদের বুদ্ধির হিসাব বাহির করিয়া সেইভাবে পাঠদান কার্যে অগ্রসর হইতে সুবিধা হইবে। বিভিন্ন বুদ্ধি সম্পন্ন দেশের প্রতিটি শিশুর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার বিপক্ষে আমাদের দেশে কারণের অভাব নাই। খরচের কথা তাহার মধ্যে একটি প্রধান। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় খরচের প্রশ্ন অবান্তর একথা ছাড়িয়া দিলেও একটা বুদ্ধিমাপক প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিতে, উহা প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে বিতরণ করিতে এবং স্কুলবোর্ড কর্তৃক মাঝে মাঝে উপদেশাদি দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে যে সামান্য খরচের প্রয়োজন হয়, টাকার পরিমাণের দিক হইতেও তাহা নগণ্য।

শ্রেণীতে সাধারণের বাহিরে যাহারা।

কোন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদিগকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—এক সাধারণ অপর সাধারণের বাহিরে যাহারা। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই সাধারণের পর্যায়ভুক্ত—কয়েকজন থাকে যাহারা সাধারণের বাহিরে। ভাল কিংবা মন্দ উভয়দিকেই সাধারণের বাহিরে হইতে পারে। আবার শারীরিক ও মানসিক উভয়-ভাবেও সাধারণের বাহিরে হইতে পারে। শারীরিক দিক হইতে নানা রকমের হইতে পারে,—কালা, কাণে কম শোনে এমন, ক্ষীণ-দৃষ্টি, উচ্চারণে দোষযুক্ত প্রভৃতি; মানসিক দিকেও যেমন—মেধাবী ও ক্ষীণবুদ্ধি। ইহা ব্যতীত এমন আছে যাহাদের বুদ্ধির

যে একেবারে অভাব তাহা নয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগত ত্রুটিও নাই কিন্তু হয় অতিরিক্ত দুষ্ট, শিশুকাল হইতে কোনরকম শিক্ষা ও শৃঙ্খলার অভাবে কোন বাধ মানে না, নয় অতিরিক্ত আবেগ-প্রবণ; হয়তো বা অতিরিক্ত লাজুক কিংবা রুক্ষস্বভাব কিংবা সদা অপ্রফুল্ল। আর একদল আছে যাহাদের মানসিক শক্তির বিকাশ হয় নাই। যাহারা অপ্রচুর জীবনীশক্তি বিশিষ্ট এবং সমাজের দশজনের সঙ্গে যাহাদের সমতা নাই। সাধারণের বাহিরে এই সব ছেলেমেয়েদের সংখ্যা শ্রেণীতে যে অনেক থাকে তাহা নয়, সমস্ত রকমেরই যে থাকে, তাহাও নয়—অবশ্য অনশনক্লিষ্ট দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে সংখ্যা একেবারে কম হইবারও কথা নয়—কিন্তু যতজন যে রকমেরই থাকুক না কেন তাহারা তাহাদের সেই সেই অবস্থা লইয়াই আজ সমাজের কাছে, দেশের কাছে, রাষ্ট্রের কাছে যতটা সম্ভব মানুষের মত বাঁচিবার দাবী করে। আজ পৃথিবীর সকল দেশেই সাধারণের বাহিরে এই সকল শিশুদের শিক্ষার বিশেষ সুযোগ আছে কিন্তু আমরা এমনই হতভাগ্য যে দীর্ঘদিন ধরিয়া পাশ্চত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও আমরা নিজেদের জন্য কিছু করিতে পারিলাম না। আমাদের ইহা প্রয়োজন—এই দাবি আমরা দৃঢ়ভাবে জানাইতে পারি নাই বলিয়াই আমাদের দিন বৃথা চলিয়া গিয়াছে। দাবি যে জানাইতে পারি নাই তাহার একটি কারণ এই যে শিক্ষার অভাবে আমাদের কী প্রয়োজন এবং তাহা কিরূপে মিটান যাইতে পারে আমরা জনসাধারণ তাহা কিছুই জানি না।

পৃথিবীর বিভিন্নদেশে আজ এই সব শিশুদের শিক্ষার জন্য বড় বড় শিক্ষাবিদগণ নিযুক্ত আছেন। আমেরিকাতে এ বিষয়ে ব্যাপক আয়োজন হইয়াছে। কালা, অন্ধ, স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন, নির্বোধ প্রভৃতিদের জন্য সেখানে পৃথক আবাসিক বিদ্যালয় আছে, নানা রোগগ্রস্ত শিশুদের জন্য হাসপাতাল আছে। অল্প কিছুদিন হয় সেখানকার সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাই আধুনিক মনোবিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে দেওয়া হইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণের বাহিরে এই জাতীয় কত শিশু আছে, তাহার সংখ্যাও তাহারা বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। হিসাবটা এইরূপ ঃ—(১) ৫ লক্ষ ক্ষীণবুদ্ধি শিশু, (২) ৩০লক্ষ কালা, (৩) ৩ লক্ষ পঙ্গু, (৪) ৫০ হাজার ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন, (৫) ৭½ লক্ষ শিশু সমস্যাপূর্ণ আচরণকারী, (৬) ৭০ হইতে ৮০ লক্ষ শিশুর খাদ্যাভাবে উপযুক্ত পুষ্টি হয় না, (৭) ১০ লক্ষ শিশু উচ্চারণদোষযুক্ত এবং (৮) ১০ লক্ষ শিশু অসাধারণ মেধাবী। ইহাদের শতকরা হিসাব যথাক্রমে (১) ২, (২) ২, (৪) ০·২ (ইহার মধ্যে অন্ধদেরও ধরা হইয়াছে), (৫) ৩, (৬) ২০, (৭) ৪, (৮) ৬।[১]

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষাদানে অগ্রসর হইবার পূর্বেও এইরূপ হিসাব বাহির করিয়া লওয়ার প্রয়োজন আছে। আমেরিকা গভর্ণমেণ্টের ঐ হিসাব হইতে এই কথাটিই খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে যে গভর্ণমেণ্ট তাহার প্রত্যেকটি

(১) White House Conference on child health & Protection. Section III. Education & Training. Special Education.

অধিবাসী সম্বন্ধে সজাগ এবং প্রত্যেককে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া সমাজে দাঁড় করাইয়া তুলিতে সচেষ্ট। আমাদের দেশে এরূপ কোন হিসাব হয় নাই। আমাদের দরিদ্র দেশে এরূপ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই—একথা মানিয়া লওয়ার কোন অর্থ হয় না। পৃথিবীর সকল দেশে হইতেছে, আমাদের হইবে না কেন? আমাদের আবেষ্টন ও বৈশিষ্ট্যানুযায়ী ব্যবস্থা আমাদিগকে করিতেই হইবে। তাহারা পারে, আমরা পারিব না কেন?

শ্রেণীর শিশুদলের বুদ্ধির বয়স বাহির করিয়া তাহাদিগকে অন্ততঃ তিনটি দলে ভাগ করিয়া লওয়া দরকার। একদল যাহাদের আই, কিউ ৯০ হইতে ১১০—ইহারা সাধারণ পর্যায়-ভুক্ত। আর একদল যাহাদের আই, কিউ ৯০র কম—ইহারা ক্ষীণমেধা ও তৎপর্যায়ভুক্ত। আব একদল যাহারা মেধাবী বা অসাধারণ মেধাবী তাহাদের আই, কিউ ১১০র উপরে ১৪০ পর্যন্ত কিংবা তদূর্ধ। বুদ্ধির দিক হইতে এইভাবে ভাগ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে মেধাবী ও অসাধারণ মেধাবী-দের জন্য এবং মানসিকশক্তির বিকাশই হয় নাই এমন শিশুদের জন্য ভিন্ন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা বিশেষ দরকার। কেননা সাধারণের সঙ্গে তাহাদের সমতা নাই। একদলের শক্তি বেশি, অপরদলের শক্তি কম। শ্রেণীর শিক্ষাসূচী সাধারণ ছাত্রদের অনুযায়ী হয়। মেধাবী বা অসাধারণ ছাত্রদের কেবল ঐটুকুই পড়িতে হইলে তাহাদের শক্তির অপচয় ঘটিয়া থাকে। এবং হাতে যখন কাজ না থাকে তখন

তাহারা তাহাদের শক্তিকে নানাভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাতে অনেক ছেলে খারাপ হইবার সুযোগ ও সময় পায়। খারাপ ছেলে বলিতে কেবল বোকা ছেলেকেই বুঝায় না— পড়াশুনায় ভাল ছেলেরাও অন্যান্য নানা দোষে দুষ্ট হইতে পারে। মেধাবী ছাত্রের সংখ্যার হিসাব আমাদের দেশে করা হয় নাই বটে কিন্তু যদি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মতই বাংলাদেশের মেধাবীছাত্রের সংখ্যা ধরা যায় তবে শতকরা ৬ জন হিসাবে বাংলাদেশে মেধাবী ছাত্রের সংখ্যা মোট ৩½ লক্ষের উপর দাঁড়ায়। খাইতে না পাইলেও বাঙ্গালী ছাত্রের মাথায় বুদ্ধি আজও আছে একথা সর্বদাই শুনিতে পাই, তাই উপরের হিসাবে বিশেষ ভুল নাই বলা চলে। কিন্তু ইহাদের জন্য আমাদের কোনও ব্যবস্থা নাই; ইহাতে দেশের সমষ্টি-শক্তির যে একটা বিরাট ক্ষতি হইতেছে তাহা অনুধাবন-যোগ্য। কেবল বুদ্ধির বয়সপ্রাচুর্যতাই ভিন্ন শিক্ষাদানের দাবি করিতে পারে না, বুদ্ধির বয়সপ্রাচুর্যতার সঙ্গে যাহাদের স্বাস্থ্য, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি অন্যান্য গুণও থাকে, তাহারাই ভিন্ন শিক্ষার অধিকারী। ইহাদিগকে তাড়াতাড়ি এবং বারে বারে প্রমোশন দিলেই সমস্যার সমাধান হয় না। সেরূপ করার একটা অসুবিধা এই যে বয়সে বড় ছাত্রদের সঙ্গ অনেক সময়ই অল্পবয়স্ক ছাত্রের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। শ্রেণীর শিক্ষাসূচীতে মেধাবী ছাত্রদের জন্য ভিন্ন করিয়া ব্যবস্থা রাখা দরকার। সেই সূচী ভিন্ন ক্লাশে তাহাদের পড়ান উচিত। এই বিশেষ ক্লাশের ব্যবস্থা আজ সকল দেশেই স্বীকৃত হইতেছে। সেই ক্লাশে

তাহাদিগকে বেশি করিয়া ব্যক্তিগত শিক্ষা ও স্বাধীনতা দিতে হইবে; এমনভাবে চালাইতে হইবে যাহাতে তাহারা নিজেরাই অনুসন্ধান, গবেষণা বা তত্ত্বপরীক্ষায় উৎসাহী হয়। এই সময় শিক্ষকের কথা শুনিয়া শুনিয়া মুখস্থ করার অভ্যাস কমাইতে হইবে। ভৌগলিক দৃশ্য বা স্থান, ঐতিহাসিক স্থান, চিত্রশালা, যাদুঘর প্রভৃতি দেখাইতে হইবে। সর্ববিষয়ে যাহাতে তাহাদের ঔৎসুক্য বাড়ে এবং চিন্তা করিতে শেখে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহাদের সম্মুখে জীবনের একটা পরিপূর্ণ চিত্র তুলিয়া ধরিতে হইবে। পরিবার সমাজ দেশ ও রাষ্ট্রের অপেক্ষায় একটি ব্যক্তির সম্বন্ধ ও স্থান কোথায়, এই বিশ্বের চেতন অচেতন সকল বস্তুর সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কি ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া অথচ তাহার বোধগম্যভাবে তাহাকে জানাইতে হইবে। তাহার চোখের সম্মুখে একটি সমগ্র ও কল্যাণময় চিত্র তুলিয়া ধরিতে হইবে। সে আজ কোথায় কি অবস্থায় আছে তাহাও তাহাকে বুঝাইতে হইবে। জীবনের এই চিত্র যে সাধারণ ছাত্রদের সম্মুখেও তুলিয়া ধরিতে হইবে, একথা এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সাধারণ ছাত্রদের সংখ্যা বেশি এবং তাহারা দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধান অংশ। দেশ-সমাজ-রাষ্ট্রের উন্নতি করিতে হইলে ইহাদের উন্নত করিতে হইবে। সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে এ সকল কথা বুঝিতে পারা যে অসম্ভব হইবে তাহা নয়। তবে তাহাদিগকে সেইভাবে গঠিত করিতে বিশেষ সাহায্য করিতে হইবে। একথা মনে রাখিতে হইবে যে কোন একটা বড় ভাব বা কর্ম কেহ একা

চালাইতে পারিবে না, চারিদিকের প্রতিকূল আবেষ্টনী তাহাকে সর্বদা যে বাধা দিবে, তাহা কাটাইয়া উঠা সহজ নয়। তাই সকল ছাত্রকেই পরিপূর্ণ জীবনচিত্রের কথা শুনাইতে ও বুঝাইতে হইবে। কেবল ছাত্রদের বুঝাইলেই হইবে না, তাহাদের পিতামাতা অভিভাবকদের নিকটও এ বার্তা পৌঁছাইতে হইবে। সমাজের অপর সকলের মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেককে আমাদের সম্বন্ধে সজাগ হইতে হইবে। আমরা যেমন তেমনই থাকিয়া যাইয়া ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় উন্নত করিতে চেষ্টা করিলে কোন লাভ হইবে না। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে কোন একদিকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকিলেই অন্য অনেক ব্যাপারেই তাহার বৈশিষ্ট্য থাকিবে— ইহার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে এই বিশ্বাস ভুল। কোন এক বিষয়ে দক্ষতা থাকিলে অন্য প্রায় অনেক বিষয়েই দক্ষতা থাকিতে পারে এবং থাকে, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। অবশ্য সকল বিষয়েই যে থাকিবে, তাহা নয়। তাই এই সকল মেধাবী ও অসাধারণ মেধাবী ছাত্রদের যাহাতে পূর্ণবিকাশ হইতে পারে, তাহার সকল প্রকার সুযোগ দেওয়া কর্তব্য। একটা মুক্ত ও বৃহৎ আবহাওয়ার মধ্যে দৈহিক ও মানসিক সকল বৃত্তিকে প্রসারিত করিবার সুযোগ পাইলে যাহার মধ্যে যেটি বিশিষ্ট ভাবে থাকে তাহা ফুটিয়া উঠিতে পারে এবং সেই সঙ্গে অপর অনেক গুণাবলীর বিকাশ পাইতে পারে। অবশ্য বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাই জীবনে বিশিষ্টস্থান লাভ করিবার পক্ষে একমাত্র কথা নয়, সে কথা মনে রাখিতে

হইবে। যাহাদের বেশি বুদ্ধি থাকে, তাহারাই যে নামকরা লোক হয়, তাহা নয়। অনেক সময় বুদ্ধি বেশি থাকাই ক্রুটিকর হইয়া দাঁড়ায়। দেশের জনসমাজের নেতা হইতে হইলে কম বুদ্ধিও যেমন অন্তরায়, অতিরিক্ত বুদ্ধি থাকাও অন্তরায়। কেননা মানুষের দৈহিক ও মানসিক সমগ্র ব্যক্তিত্বটাই নেতৃত্ব করে, বুদ্ধি তাহার একটা উপাদান মাত্র। যাহাদের মেধার তীক্ষ্ণতার সঙ্গে ব্যক্তিত্ব আছে, তাহাদিগকেই সর্বপ্রকার সুযোগ দিয়া দেখিতে হইবে, তাহারা জীবনে বড় হইতে পারে কিনা। দেশ সমাজ ও রাষ্ট্র যেন এইসব ছাত্রদের সেবা হইতে বঞ্চিত না হয়।

অনেকের মতে মেধাবীছাত্রদের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা গণতন্ত্র বিরোধী। কিন্তু প্রতিপক্ষ বলেন বিভিন্ন স্থানে এইরূপ ক্লাশ খুলিয়া কুফল পাওয়া যায় নাই। শিশুরা হামবড়া বা গণতন্ত্রবিরোধী ভাব দেখায় না। বরং সাধারণ ক্লাশে যেখানে তাহাদের প্রতিযোগিতা করার সুযোগ ছিল না, এখানে আসিয়া প্রতিযোগিতা করিতে হয় বলিয়া অহংকারী হইবার সুযোগ পায় না। এদিকে সাধারণক্লাশ ভাল ছাত্র হইতে বঞ্চিত হওয়াতে এই ব্যবস্থা সাধারণ ছাত্রের প্রতিযোগিতা মূলক উন্নতির পক্ষে বাধার সৃষ্টি করিবে, তাহাও বলা চলে না। বরং সকলে একই সঙ্গে শিক্ষা পাইলে ভাল ছাত্রকে দেখিয়া সাধারণ ছাত্রের নিজের সম্বন্ধে আশাহীন হইয়া পড়িতে পারার সম্ভাবনা থাকে। মোটকথা এ পর্যন্ত দেখা গিয়াছে যে মেধাবী ও অসাধারণ মেধাবীর জন্য বিশেষ ক্লাশের ব্যবস্থা কোন পক্ষেরই ক্ষতিকর হয় না।

যে সকল শিশুদের মানসিকবৃত্তির বিকাশ হয় নাই, সমাজের সঙ্গে সমানভাবে চলিবার ক্ষমতায় যাহারা জন্ম হইতেই বঞ্চিত এবং যাহারা অপ্রচুর জীবনীশক্তি বিশিষ্ট, সাধারণের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলে তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেওয়া হয়। তাহাদের ব্যক্তিগত অধিকারের কথা বাদ দিয়া সমাজের দিক হইতে দেখিলেও বলা যায় যে তাহারা যখন বাঁচিয়া থাকিবে, তখন এমন ভাবেই তাহাদের বাঁচান উচিত যে তাহারা সমাজের ভারস্বরূপ না হয় এবং তাহাদের সাধ্যমত শক্তিদ্বারা নিজের ও অপরের কাজ করিয়া যাইতে পারে। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে শিশুদের এইরূপ হওয়ার একমাত্র প্রধান কারণ বংশানুবর্তন। বহু পরিবারের ইতিহাস ইহার প্রমাণ দিয়াছে। খুব কম সংখ্যাই রোগ বা আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে হয়। এইরূপ অবস্থার কোন ঔষধ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহার একমাত্র চিকিৎসা হইতেছে—আবেষ্টনীকে নানাভাবে পরিবর্তন করিয়া শিশুকে শিক্ষা দেওয়া। ট্রেণিং দেওয়া ছাড়া ইহাদের জন্য আর কোন ঔষধ নাই। এই জাতীয় শিশুর বংশ বৃদ্ধি যাহাতে না হয় সেজন্য ইহাদের সন্তানাদি হওয়া বন্ধ করা দরকার। সাধারণের বহির্ভূত এই সকল শিশুকে যথাসম্ভব সামাজিক জীব করিয়া কিভাবে গড়িয়া তোলা যায়, তাহা বাহির করিতে হইবে। অনেকে মনে করিয়া থাকে যে মানসিক বৃত্তির অসম্পূর্ণতা ৭। ১৪। অথবা ২১ বৎসর বয়সের মোড়ে সারিয়া যাইবে, সেজন্য তাহারা উহাদের জন্য কিছু না করিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু ইহা ভুল। যত শীঘ্র সম্ভব এই সকল শিশুদের শিক্ষা

আরম্ভ করিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয় ; দেরি করা মারাত্মক। উহাদের যতটা শক্তি আছে, সবটুকুকে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাদের জন্য ভিন্ন বিদ্যালয় বা ভিন্ন ক্লাশ করিতে হইবে। যত কম সম্ভব বুদ্ধির প্রয়োজন হয় এমন কতকগুলি কাজের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে চালাইয়া লইতে হইবে। উহাদের মধ্যে যাহাদিগকে সম্ভব কিছু লেখাপড়া করান যাইতে পারে। কিন্তু রান্না করা, সেলাই করা, নানারকম শারীরিক পরিশ্রমের কাজ, বাগানের কাজ, নানারকম শিল্পকর্ম ইত্যাদির মধ্য দিয়া তাহাদিগকে সমাজে দাঁড় করাইতে হইবে। অভ্যাসই ইহাদের প্রধান সহায়। বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুরা সারাদিন বা দীর্ঘসময় পর্যন্ত এক কাজ কিছুতেই করিতে পারিবে না, কর্মবৈচিত্র তাহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু এইসব বুদ্ধিহীন শিশুদের প্রত্যেকের ইচ্ছা, ঝোঁক ও শক্তি অনুযায়ী সাধারণতঃ একটি কর্মের দিকেই জোর দিতে হইবে। অল্পবয়স হইতে সেই একটি কর্ম ক্রমাগত করিয়া আসিলে অনেকেই তাহার মধ্যে বেশ দক্ষতা লাভ করে এবং তাহাদ্বারাই নিজের ও সমাজের সেবা করিতে পারে। ইহাদিগকে শিক্ষা দিবার সময় এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে এইরূপ প্রত্যেকটি ছেলে বা মেয়েকে তাহাদের অবস্থানুযায়ী একটি স্থান সমাজে লইতে পারার যোগ্য করিয়া দেওয়াই শিক্ষার লক্ষ্য।

পুঁথিগত শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা এবং সামাজিক ব্যবহার ইত্যাদি শিক্ষা পরস্পরে মিলাইয়া দিতে হইবে, এবং শিশুর ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও শক্তি অনুসারে কোনটার উপর কমবেশী

জোর দিয়া চলিতে হইবে। দেখা গিয়াছে যে এইরূপ ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর শিক্ষায় শিল্প শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক, কারণ ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন শিশু পড়ালেখা শিখিয়া সেই পড়ালেখা দ্বারা সাধারণতঃ জীবিকা অর্জন করিতে পারিবে না। অবশ্য পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষা দিবার কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেও চলিবে না। শিশুর বুদ্ধি যতটুকু পুঁথিগত বিদ্যা গ্রহণ করিতে সক্ষম, ততটুকু তাহাকে দিতেই হইবে। শিশুর মানসিক শক্তি যতটুকু আছে, সেই অনুসারে তাহাকে ততটুকু বিদ্যাদান করিলে তাহার এই সামান্য পুঁথিগত বিদ্যা তাহাকে জীবনে আনন্দ দান করিবে এবং তাহাকে জীবনের উচ্চস্তরে লইয়া যাইতে সাহায্য করিবে। কিন্তু ইহাতে তাহার মানসিক শক্তির উপর চাপ না পড়ে তাহা দেখিতে হইবে। কেননা সে তাহা হইলে উহা হজম করিতে পারিবে না। বরং এই প্রচেষ্টার ফলে সে অসুখী হইবে। ইহাতে তাহাকে অসামাজিক করিয়া ফেলিতে পারে। ইহা ব্যতীত ক্ষীণবুদ্ধি শিশুকে তাহার ক্ষমতার বাহিরে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়া, তাহার দরুণ চেষ্টা যত্ন ও টাকা পয়সার যথেষ্ট অপচয় হইবে। এই জাতীয় ক্ষীণবুদ্ধি শিশুর পক্ষে বিদ্যা শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষা অপেক্ষাও সামাজিক শিক্ষা অত্যধিক প্রয়োজনীয়, কারণ যে ক্ষীণবুদ্ধি শিশু সামান্য পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে এবং শিল্পও কিছু শিক্ষা করিয়াছে, অথচ যাহার কোন সামাজিক রীতিনীতি, চলাফেরা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান জন্মে নাই, সে ঐ সকল কাজে লাগাইতে পারিবে না, ইহাতে সে বিফল মনোরথ হইবে। পক্ষান্তরে যদি সে পুঁথিগত

বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা কমও শিক্ষা করে, অথচ সামাজিক রীতিনীতি চালচলন ও অন্যান্য আদবকায়দায় অভ্যস্ত হয় তাহা হইলে তাহার নিজের প্রতি অযোগ্যবোধ বিদূরিত হইবে। তখন অন্যান্য শিক্ষা তাহাকে সাহায্য করিবে। অতএব ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতি শিশুকে সামাজিক ব্যবহারিক শিক্ষাগুলি বেশি করিয়া দিতে হইবে। এইসব শিশুকে প্রতিযোগিতামূলক খেলায় সাধারণ শিশুর সঙ্গে খেলিতে দিতে হইবে, কারণ এমন বহু ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন শিশু আছে যাহারা খেলায় সাধারণ শিশুর মতই উপযুক্ত, এমন কি সাধারণ হইতে অপেক্ষাকৃত ভালও। এই ব্যবস্থাতে ক্ষীণবুদ্ধিদের নিজেদের প্রতি অযোগ্যবোধ অনেক পরিমানে দূর হইবে।

একদল ছেলে আছে যাহাদের বুদ্ধিরও একান্ত অভাব নাই, বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগত ত্রুটিও নাই, তবু তাহাদিগকে সাধারণ পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। ইহাদের মধ্যে কেহ আছে অতিরিক্ত দুষ্টু; শিশুকাল হইতে কোনরকম ট্রেণিং বা শৃঙ্খলার মধ্যে না থাকায় এখন আর কিছুতেই স্থিব হইয়া কিছুই করিতে পারে না। আমাদের দেশে এরূপ ছেলের সংখ্যা কম নয়। কেননা পিতামাতার গৃহে শিক্ষা বা ট্রেণিং এবং শৃঙ্খলা বলিয়া আমাদের সাধরণতঃ কিছু নাই বলিলে ভুল হয় না। শিশুকাল হইতে কোন শৃঙ্খলার মধ্যে বধিত না হইলে, বিদ্যালয়ে তাহাদিগকে কোন শৃঙ্খলার মধ্যে আনা এক দুরূহ ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি এগুলি খুব মারাত্মক অবস্থা নহে। শিক্ষকের সস্নেহ ব্যক্তিত্ব ও কৌশলপূর্ণ ব্যবহারই ইহাদিগকে

আয়ত্তে আনিতে পারে। এইরূপ কোন শিশুর ঝোঁক কি রকম, প্রথমে তাহা বাহির করিয়া লইতে হইবে। শিশুর স্ফূর্তি বা আনন্দ বজায় থাকে অথচ শৃঙ্খলার বাহিরে না যায়, এমন ভাবেই তাহার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। সর্বদা মনে রাখিতে হইবে কঠোর বা নিষ্ঠুর শাস্তি, বকাবকি এবং শিশুর কোন কথা কর্ম বা অবস্থা লইয়া বিদ্রূপ শিশুশিক্ষার মস্তবড় অন্তরায়। সাধারণের বাহিরের এইরূপ শিশুদের পিতামাতা বা অভিভাবক-দের জীবনধারা এবং শিশুদের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ জানিয়া লইলে শিক্ষক শিশুর মনস্তত্ত্ব সহজে ধরিতে পারিবেন। সাধারণের বাহিরে মনস্তত্ত্বগত সব রোগীর পক্ষেই একথা সত্য। এখন আমরা যাহাদের কথা আলোচনা করিতেছি তাহাদের সকলেরই রোগ কমবেশি মনস্তত্ত্ব বিকৃতির ফল হইয়াছে। আবেগপ্রবণ শিশুরা যখন যাহা ইচ্ছা করে, কোন একটি বিষয়ের প্রতি অতি-রিক্ত আসক্ত হয়, দশজনে যেরূপভাবে চলে সেরূপভাবে চলিতে পারে না; পড়া বা কোন কাজে মন বসাইতে পারে না। ইহাদের সম্বন্ধেও খুব সতর্ক কৌশলে চলিতে হইবে। অনেক সময়ই প্রথমেই ইহাদিগকে পড়ার চাপ না দিয়া ইহাদের পছন্দ মত কর্মে উৎসাহিত করিলে সেখানে তাহারা সাড়া দেয়। যে কোন শিশুদের যে কোন কাজ যখন দিব তখন একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে তাহাদিগকে এমন কাজ দিতে হইবে যাহার দ্বারা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা পরিস্ফুট হইতে পারে। কোন কিছু সৃষ্টি করিতে পারার ঝোঁক কেবল বয়স্কদের মধ্যেই সাধারণ বা স্বাভাবিক নহে, শিশুর পক্ষেও তাহা মস্তবড় সত্যি

কথা। তাহাদের সমস্ত খেলা ও কাজকে যদি তাহাদের অজানিতে এমনভাবে প্রবর্তিত করা যায় যাহাতে কোন কিছু—তাহা যত সামান্যই হউক—সৃষ্টি হয়, তবে তাহা শিশুর জীবনের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। কোন কিছু নিজে সৃষ্টি করিলে শিশুর মনস্তত্ত্ব কেবল যে সেই সৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধেই অন্যরকম হয় তাহা নহে, তাহার দেহমনের গতি একটা স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করে। বৃদ্ধি পাইবার, প্রকাশ পাইবার যে ধাক্কা সে নিজের ভিতরে অনুভব করে তাহাকে সৃষ্টির মধ্যে রূপ দিতে পারিলে সমস্ত কিছু সম্বন্ধেই তাহার মনস্তত্ত্ব বদলায়; কেননা তখন তাহার মনস্তত্ত্ব স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। ইহাতে তাহার দেহমনের পুষ্টি অনেক উন্নত ধরণের হয়। ইহা সাধারণ বা সাধারণের বাহিরে সকল শিশু সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যাহা হউক, যে শিশু পড়া পারিত না, কিন্তু কর্মের মধ্যে যোগ্যতা দেখাইতে পারিল, তাহাকে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া চলে যে একটা বিষয়ে সে ভাল, অপর বিষয়টাও সে কেন আয়ত্ত করে না? তাহা হইলে তাহার সব দিক দিয়া কত ভাল হয়। তখন লেখাপড়া সম্বন্ধেও তাহার আগ্রহ জন্মিবে—সেই আগ্রহে সে পড়ালেখা যাহা করিবে, তাহাই যথেষ্ট। এরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় লাভ করা গিয়াছে।

অতিরিক্ত লাজুক কিংবা অতিরিক্ত রুক্ষস্বভাব কিংবা সদা অপ্রফুল্ল শিশুদের শিক্ষা দিতে যাইবার আগেও তাহাদের বুদ্ধির বয়স যেমন বাহির করিতে হইবে তেমনি তাহাদের মনস্তত্ত্বও বিশ্লেষণ করিতে হইবে এবং তাহাদের পূর্বজীবনের প্রতি দৃষ্টি

দিতে হইবে। দৈহিক ও মানসিক কিরূপ আবহাওয়ায় তাহারা বর্ধিত হইয়াছিল তাহা জানা গেলে তাহাদের বিশেষ স্বভাব-গুলি সৃষ্ট হইবার কারণ স্পষ্ট হইবে। আধুনিক মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের একটি মস্ত বড় দান আমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে—শিশুর পরবর্তী জীবনের সমস্ত বিকাশের জন্য তাহার প্রথম পাঁচ বৎসরের শিক্ষা ও ট্রেণিংই দায়ী। চেতন এবং অচেতন ভাবে প্রথম দিন হইতে এই পাঁচ বৎসর পর্যন্ত যাহা শিশুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই পরবর্তী জীবনে তাহাকে চালাইয়া লইবে। শিশুর বাল্যের দৈহিক ও মানসিক সকল বৃত্তি যদি স্বাভাবিক ভাবে পুষ্ট হয় তবে শিশু স্বাভাবিক হয়; অন্যথা একটা না একটা মানসিক রোগের অধিকারী হইয়া বসে। অতএব রোগের কারণ শিশুর অতীত জীবনে পাওয়া যাইবে। কারণ জানিয়া শিক্ষক তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করিবেন। যদি কোন শিশুর মনস্তত্ত্ব এরূপ হয় যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পক্ষে তাহার বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, এমন কি সাধারণভাবেও তাহাকে লেখাপড়া কিছু শেখান যায় না, তাহা হইলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। মনস্তত্ত্ববিদ দ্বারা পরিচালিত অন্যান্য দেশে ইহাদের অন্য ব্যবস্থা রহিয়াছে। বিদেশে সকল স্থানে এই সকল মনস্তাত্ত্বিক রোগীদের জন্য হাসপাতাল প্রভৃতি আছে। আমাদের দেশে কি তেমন কিছু হয় না? আমরা হওয়াইতে জানি না বলিয়াই আমাদের কিছু হয় না। মানুষের ক্ষুধা বোধ যখন হয় এবং তীব্রভাবে হয়, তখন তাহা

মিটাইবার জন্য সে কী না করে। আমাদের ক্ষুধাবোধ আজও জাগ্রত হয় নাই। তাই দেশের প্রয়োজনীয় কোন বস্তুই ভাল ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিতেছেনা। লাজুক ছেলেরা এত অতিরিক্ত লাজুক কেন তাহার কারণ তাহার প্রথম জীবনে সন্ধান লইতে হইবে এবং বর্তমান পরিবারের আবেষ্টনেও খোঁজ লইতে হইবে। তাহাকে দশজনের মধ্যে প্রথমেই আনিয়া জোর করিয়া সামাজিক করার চেষ্টা এবং না পারিলে শাস্তি দেওয়া আজ নীতিবহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। শিক্ষক তাহার সহিত মিশিতে চেষ্টা করিবেন; অনেক সময় শিশুরা শিক্ষকের সহিত মিশিতে লজ্জা পায়; সে অবস্থায় শিশু পছন্দ করে এমন বা তাহাকে পছন্দ করে এমন অপর শিশুর সহিত তাহাকে মিশিতে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। তাহাকে অল্পে অল্পে সামাজিক করিতে হইবে। যে খেলায় বা যে কাজে তাহার উৎসাহ, তাহাকে তাহাতে নিযুক্ত করিতে হইবে।

যে ছেলে সদা অপ্রফুল্ল, তাহারও ইতিহাস জানিতে হইবে। তাহার স্বভাব হইতেই এমন একটি সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যাহার সাহায্যে তাহাকে স্বাভাবিক শিশুরূপে বাহির করিয়া আনা যায়। এক কথায় এই সকল কমবেশি মনস্তাত্ত্বিক রোগীর সহিত সতর্কভাবে মনোবিজ্ঞান অনুধাবন করিয়া চলিতে হইবে। শিক্ষকের পক্ষে সেজন্য অপরিসীম ধৈর্য প্রয়োজন।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গগত ত্রুটিপূর্ণ শিশুরও অভাব নাই। অন্ধদের ভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন। যাহারা কানে কম শোনে বা চোখে কম দেখে এমন শিশুদের জন্য ব্যবস্থা করিতে

হইবে। যাহারা চোখে কম দেখে তাহাদিগকে শ্রেণীর সম্মুখ-ভাগে বসাইতে হইবে। গৃহে যাহাতে প্রচুর আলো প্রবেশ করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বোর্ডে বড় বড় করিয়া লিখিতে হইবে। বড় অক্ষরে ছাপার বই তাহাদিগকে দিতে হইবে। লেখার কাজ কমাইয়া তাহাদিগকে কানে শুনাইয়া শিক্ষা দিতে হইবে। অপরদিকে যাহারা কানে কম শোনে তাহাদিগকে লেখার কাজের মধ্য দিয়াই অধিকাংশ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বোর্ডের কাজ বেশি করিয়া করিতে হইবে। প্রথম শ্রেণীতে এই দুই রূপ শিশু থাকিলে অসুবিধা নাই, কেননা শিক্ষক প্রথম শ্রেণীকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াই পড়ান। অন্য শ্রেণীতে এইরূপ থাকিলে তাহাকে ভিন্ন শিক্ষা দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। অসুবিধা? অসুবিধার কথা প্রথমেই বড় করিয়া দেখা দিলে সংসারে কোনদিনই কোন কাজ হইত না। পৃথিবীর বিভিন্নদেশে কত আশ্চর্য কাজ হইয়া যাইতেছে—সে সকল করার মধ্যে কোন অসুবিধা, কোন বাধা ছিল না কি? অসুবিধা জয় করিতে হইবে; সকল দেশেই তাহা হইতেছে।

বাক্যক্রমিক শিক্ষা পদ্ধতি

শিশুর শিক্ষার তিনটি অঙ্গ—শিশু, শিক্ষক ও পদ্ধতি। প্রত্যেকটির যথাস্থানে প্রত্যেকটিরই বিশেষ মূল্য আছে বটে, কিন্তু "শিশুর" সর্বপ্রকার আবেষ্টন ও চাহিদা অনুসরণ করিয়াই শিক্ষক শিক্ষাদান কার্যে অগ্রসর হইবেন এবং সেইদিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শিক্ষাদানের পদ্ধতি রচিত হইবে। শিশুর আবেষ্টন কি, তাহার বুদ্ধির বয়স কত, তাহার আগ্রহ কিরূপ, কোন্ জিনিস তাহার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বোধগম্য—শিশুকে নূতন জ্ঞান দান করিবার পূর্বে সর্বাগ্রে এই সকলের হিসাব লইতে হইবে। কোন কিছু কতটুকু সময়ের মধ্যে শিশু বুঝিতে পারে—একটি বিষয়ে তাহার আগ্রহ ও মনোযোগ সাধারণতঃ কতক্ষণ থাকিতে পারে—এই সবই দেখিয়া লইয়া তবে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া চলিবে। জ্ঞান অর্জনের প্রধান সহায় মনোযোগ। যে-বিষয় আমার নিকট প্রীতিকর, তাহার প্রতি আমার মনোযোগ যেমন সহজে আকৃষ্ট হয়, তেমনি তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয়। আর যাহার প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা আয়ত্ত করা আমার পক্ষে বিশেষ সহজ হইয়া দাঁড়ায়। কি শিশু কি বৃদ্ধ বা প্রবীণ সকলের পক্ষেই একথা পুরাপুরিই সত্য। তবু শিশুর শিক্ষাব্যাপারে ইহা একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা। বিভিন্ন বয়সের শিশুর

মনোযোগ কোন 'একবিষয়ে' একটানা কতক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে? সাধারণতঃ

৬	হইতে	৮	বৎসর	১৫	মিনিটের	অনধিককাল
৮	,,	১০	,,	২০		,,
১০	,,	১২	,,	২৫		,,
১২	,,	১৬	,,	৩০		,, *

এই অবস্থা মনে রাখিয়া শিশুর চাহিদা মিটাইতে হইবে। শিশু কী চায়, কী সে নিজের মধ্যে সহজে গ্রহণ করিতে পারিবে—এগুলি জানা থাকিলে নূতন জ্ঞানকে কিভাবে তাহার নিকট উপস্থিত করিতে হইবে তাহা বুঝা যাইবে। অনেক সময়ই শিশুর শিক্ষাদাতাকে বলিতে শোনা যায় যে, না অমুক শিশুকে দিয়া কিছু হইবে না, তাহার মাথায় কিছু নাই—একেবারে গোবর ভরা—এমন সহজ কথাটাই সে কিছু বুঝে না, ইত্যাদি। কোন শিশুর বুদ্ধি সাধারণ বুদ্ধির মান (Standard) হইতে কম হইতে পারে, কিন্তু তাহার না বুঝিতে পারার জন্য একান্তভাবে সে-ই দায়ী নয়। যাহা শিক্ষাদাতা সহজ বলিয়া বুঝিতেছেন, তাহা যে শিশুর নিকটও সহজ হইবে তাহার প্রমাণ কি? শিশুর বুদ্ধির বয়স, শিশুর দৃষ্টিকোণ ইত্যাদি বিচার না করিলে কোন একটি বিশেষ জ্ঞান শিশু-মনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইল কি না তাহা বুঝাই যাইবে না। তাই শিশুর নিকট কেবল কতকগুলি জ্ঞানকে উপস্থিত

* শিক্ষা শিশুর বিশেষ প্রীতিকর হইলে মনোযোগের কাল আরও বাড়ান সম্ভব।

করিলেই চলিবে না। সেগুলিকে এমনভাবে শিশুর কাছে ধরিতে হইবে যাহাতে সে যে-স্তরে আছে—বিদ্যা:বুদ্ধি মনোযোগ প্রভৃতি তাহার সকল সম্পদ লইয়া সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে,—তাহার সেই অবস্থার সহিত ঐ জ্ঞান খাপ খায়, সহজ ও স্বাভাবিক হয়। একমাত্র তাহা হইলেই নূতন জ্ঞান গ্রহণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে। যাহা বলা, করা বা যেভাবে চলা শিশুর সহজাত স্বভাব তাহার শিক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটাকেও সেই প্রকৃতির করিতে হইবে; যে-কথা, কাজ, চিন্তা বা ভাব সে বুঝিতে পারে সেইরূপ কথা, কাজ, চিন্তা বা ভাবের সহিত যুক্ত করিয়া শিক্ষা দিলেই সে-শিক্ষা তাহার পক্ষে সহজ ও স্বভাবগত হয়। শিশুর দৈহিক বা মানসিক ইন্দ্রিয়ের শক্তির যে সীমা, তাহা হইতে একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির আবেষ্টনে নিজেকে স্থাপিত করিয়া তাহা হইতে সে কিছু লাভ করিতে পারে না। সেইরূপ চেষ্টায় তাহার শক্তির অযথা অপব্যয় হয় মাত্র। তাই তাহার ব্যক্তিগত রুচি ও শক্তি, তাহার পারিবারিক ও সামাজিক আবেষ্টন অর্থাৎ তাহার অবস্থানের চারিদিক,—এককথায় যে সকল দিকের সঙ্গে শিশুর জীবন ভিতরে বাহিরে যুক্ত আছে, তাহার শিক্ষাকেও সেই সকলের সঙ্গে যোগ করিয়া দিতে হইবে। শিশুর ভালমন্দ লাগা, তাহার চলাবলাকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার শিক্ষা পদ্ধতি গঠন করিতে হইবে। নয়তো শিক্ষা শিশুর পক্ষে বোঝা-স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। এবং সেই নিরানন্দময় বোঝার ভারে গ্রামের অধিকাংশ প্রাথমিক শিক্ষার্থী শিক্ষা পরিত্যাগ করে

কিংবা কোন প্রকারে উহা টানিয়া লইতে থাকে। তাহার ফলে তাহাদের জীবন হইতে স্ফূর্তি, আনন্দ, কর্মশক্তি, স্বাভাবিক প্রবণতা ইত্যাদি সমস্তই অন্তর্ধান করে এবং শেষ পর্যন্ত এই শিশুরাই সমাজ, দেশ ও পরিবারের ভার স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। তাই শিক্ষাব্যাপারে শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে এত অবহিত হইতে হয়। অবশ্য তারপরেও কথা আছে। পদ্ধতি যতই উঁচুদরের হউক না কেন, সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে, যদি শিক্ষক উপযুক্ত না হন। শিক্ষাব্যাপারে শিক্ষকের স্থান সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

কথাটা হইল এই যে, শিক্ষাকে শিশুর আবেষ্টন ও মনোবিজ্ঞানসম্মত করিতে হইবে। অন্যান্য দেশে পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করিয়া শিশুর শিক্ষাকে আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছেন। আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে প্রায় কোন চেষ্টাই হয় নাই, অন্ততঃ তাহা কার্যক্ষেত্রে রূপ পরিগ্রহ করে নাই। মহাত্মা গান্ধীর ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের আমলে আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অনুপস্থিতিতে সকল দিক দিয়া সমগ্র দেশের উপযোগী এতবড় একটা শিক্ষাব্যবস্থা অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

যাহা হউক, যে প্রচলিত পদ্ধতিতে আজ আমরা শিশুকে বর্ণপরিচয় করাই, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও আধুনিক নানা গবেষণার ফলে তাহার নানা ত্রুটি ধরা পড়িতেছে। প্রচলিত পদ্ধতি বলিতে আমরা বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিই বুঝিয়া থাকি। এই পদ্ধতিমতে প্রথমে অ আ ক খ প্রভৃতি বর্ণগুলি সব মুখস্থ

করাইয়া তারপর তাহার সাহায্যে শব্দ এবং তাহারও পরে বাক্য-গঠন শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার ক্রমে বাক্যকে শেষে স্থান দেওয়া মনোবিজ্ঞানের একান্ত বিরোধী। কেবল তাহাই নহে, শিশুর শিক্ষার জন্য যতগুলি প্রয়োজন উপরের বক্তব্যে বোধ করা গিয়াছে, প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে তাহাদের প্রত্যেকটিরই অভাব আছে এবং সেই অভাব হেতু যে কুফল হওয়া সম্ভব তাহাও আমাদের উপর বর্তিয়াছে। বাঙ্গালা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার ফলে কি প্রতিক্রিয়া হইতেছে ও হইয়াছে, আমরা একবার তাহার হিসাব লইব। কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কেন প্রতি ঘরে ঘরে শিশুকে বর্ণপরিচয় হইতে বাক্যগঠনের দরজা পার করিতে কিরূপ মেহনৎ করিতে হয় এবং পড়াশুনার প্রতি শিশুর বীতরাগ কিরূপভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, তাহার অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে। শিশুর এই কঠিন বীতরাগের প্রধান কারণ এই যে, সারাদিন শিশু যাহা দেখে, করে বা বলে তাহার সহিত সে বইর মধ্যে যাহা দেখে বা যাহা পড়িতে অনুরুদ্ধ হয় তাহার সহিত কোনই সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায় না। সেইজন্যই 'পড়িতে বস', শুনিলেই তাহার সকল দেহমন বিদ্রোহ করিতে চায়। এইক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রথমে পাঠে ফাঁকি দিতে থাকে, তারপর বিদ্যালয় হইতে পলাইতে আরম্ভ করে, তারপর গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার্থী শিক্ষা চিরতরে বিসর্জন দেয়। শিশুশিক্ষার্থীর পক্ষে বিদ্যালয়টা যে আরও ভয়াবহ হইয়া উঠে, তাহার আর একটি কারণ এই

যে, সচলতা যে-শিশুর সহজাত সংস্কার, সেই শিশুকে যখন ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়া বেঞ্চির উপর নিস্পন্দভাবে বসিয়া শিক্ষকের বক্তৃতা শুনিতে হয়, তখন তাহার মত শাস্তি শিশুমনের পক্ষে আর কি হইতে পারে? বোধহয় একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও বর্তমানযুগে শিশুশিক্ষার এইরূপ দুঃসহনীয় পদ্ধতি প্রচলিত নাই।

প্রচলিত বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে প্রথমে অ, আ, ক, খ হইতে ং, ঃ, ঁ পর্যন্ত মুখস্থ করাইয়া তারপর শব্দ সৃষ্টি করা হয়। অ, আ, ক, খ যখন শিশু মুখস্থ করিয়াছিল, তখন তাহার মধ্যেই কোন রস পায় নাই। সেই তেরটি স্বরবর্ণ ও পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ শিখিতে শিশুর যে শক্তি ক্ষয় হইয়াছে, তাহা উল্লেখযোগ্য। আর সময়ও তাহার লাগিয়াছে প্রচুর। যে সকল শিশু গৃহে বর্ণপরিচয় লাভ করে, তাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল; কিন্তু যাহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাইয়া বর্ণ শিক্ষা করে, তাহাদের অবস্থা বড়ই শোকাবহ। সমস্ত ভারতবর্ষের মত বাঙ্গালাদেশেও গ্রামের সংখ্যাই বেশি এবং মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে এবং শতকরা ৮৮ ভাগ লোকে নিরক্ষর। অতএব নিজের বাড়ীতে রাখিয়া বর্ণ পরিচয় করাইবার লোকের সংখ্যা কত হইতে পারে তাহা সহজেই বোঝা যায়। ১৯৩৮ খ্রীঃ এ বাঙ্গালাদেশের কয়েকটি জিলায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ায় সেই সকল জেলার লোকেরা শিক্ষার জন্য শিশুদিগকে বিদ্যালয়েই পাঠাইয়া থাকে। অবশ্য ১৯৩৮-এর পূর্বেও প্রাথমিক

বিদ্যালয় দেশে ছিল। কিন্তু ১৯৩৮-এর পরে শিক্ষা ব্যাপকভাবে অবৈতনিক হওয়ায় দেশের লোকের সুবিধা হয়। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুশ্রেণীতে বেশ অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ভর্তি হয়। তাহাদের মধ্যে কেহ বা বর্ণপরিচয় করিয়া আসিয়াছে, কেহ বা একেবারেই কিছু জানে না। পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষাকাল পাঁচ বৎসর ছিল, ১৯৫৮ খ্রীঃ-এ নানা বিবেচনায় উহাকে চারি বৎসর করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে যাহারা ভর্তি হয়, প্রথম শ্রেণীর যে পাঠ্যসূচী আছে, একবৎসরের মধ্যে তাহা শেষ করাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে সেই সব শিক্ষার্থীকে উত্তীর্ণ করান গ্রামের শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়। ইহার অনেক কারণের মধ্যে বর্তমান প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি একটি মস্ত বড় কারণ। প্রথম শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাহাদের বর্ণ জ্ঞান হয় নাই, বর্ণ জ্ঞান লাভ করিতেই তাহাদের একটি বৎসর কাটিয়া যায়। শিক্ষক তাহাদের বর্ণগুলি মুখস্থ করিবার উপদেশ দিয়া ঐ শ্রেণীরই যাহারা একটু অগ্রসর, তাহাদের পাঠের তদ্বির করেন। ভারতবর্ষের মত দরিদ্রদেশে যেখানে বালক-বালিকাকেও সংসারের আহার সংগ্রহের কাজে সাহায্য করিতে হয়, ছেলেদের মাঠে হাটে যাইতে হয়, মেয়েদের অন্যান্য কাজ করিতে হয়, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার কাল পাঁচ বৎসর হইতে চারিবৎসর করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু সময়ের সেই পরিমাণে যদি শিক্ষাসূচী ও পদ্ধতির পরিবর্তন না হয়, তবে কার্যক্ষেত্রে তাহা অবাস্তব হইয়া পড়ে। যে পদ্ধতিতে যেরূপ বই প্রথম শ্রেণীর জন্য লেখা হয় সেই পদ্ধতি বর্তমানে

অপাঙ্‌ক্তেয় ; যে সকল বিষয় যে ষ্টাণ্ডার্ডে (standard) লেখা হয়, তাহা উপযুক্ত ফলপ্রদ নয়। বর্ণপরিচয়ের দরজা পার হইয়া শব্দ সংযোগের যে আবর্তে আসিয়া প্রথম শিক্ষার্থী উপস্থিত হয় সেখানে সে থই পায় না। অজ, অথ, অমল, ইতর, সহচর, অগণন প্রভৃতি শব্দ তাহার প্রীতিকর হইবে কিরূপে? কেননা শব্দগুলি সহজ হইতে পারে, কিন্তু শিশুর পরিচিত একেবারেই নয়। শিশুর আবেষ্টনের সঙ্গে একেবারেই খাপ খায় না। তাই এগুলির অর্থ তাহার কাছে স্পষ্ট নয়। শিক্ষক দুই একবার হয়তো অর্থ বলিয়া দিয়া থাকিবেন, কিন্তু সে শিশুর মনেও থাকে নাই, তাহার নিকট সহজ ও স্পষ্টও হয় নাই। আর প্রথম শ্রেণীর শিক্ষাসূচীতে অর্থ শিখাইবার কোন সুযোগ বা ব্যবস্থাও নাই। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, পরিচিত বস্তুর চিন্তা কথা বা কার্যের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া শিশু-শিক্ষার প্রধান অঙ্গ, কেননা অপরিচিত আবেষ্টন হইতে কিছু সংগ্রহ করিতে শিশুর দৈহিক ও মানসিক শক্তির অযথা অপব্যয় হয় মাত্র। তাই অজ, অথ, অমল, ইতর পড়িতে শিশু কোন সহজ আনন্দ পায় না। কিন্তু যাহা সহজ নয়, কর্তব্য বোধ মাত্র, তাহার শুষ্কতার মধ্যে শিশু কেন, কোন মানুষই অবাধে বিচরণ করিতে পারে না—তাই গতি সেখানে রুদ্ধ। তাই তো শিশু অজ, অথ যেন আর পার হইতে পারে না।

সাধারণ বর্ণসংযোগ পার হইয়া শিশু-শিক্ষার্থী যখন সংযুক্ত বর্ণের অরণ্যে প্রবেশ করে, তখন বিপদ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠে। পূর্বের অজ, অথ, সহচর, অগণন তবু শব্দ হিসাবে

সহজ ছিল, কিন্তু যে-সংযুক্ত বর্ণ প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা যে কেবল কঠিন তাহাই নয়; উহা শিশুর পক্ষে অত্যন্ত নিষ্প্রয়োজনীয় এবং শিশুর পরিচিত আবেষ্টনের একেবারে সাত সমুদ্র তের নদীর ব্যবধানে। শিশু কেন শিশুর শিক্ষকও উড্ডীন, দুষ্প্রবেশ, ঝঞ্ঝা, জিঘাংসা, সংস্করণ প্রভৃতি শব্দ ক্বচিৎ ব্যবহার করেন। এই শব্দগুলি শিখিতে শিশুর পক্ষে যে পরিশ্রম হয়, তাহা অমানুষিক। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন হওয়ার জন্য আমাদের শিক্ষাকে যে অতিবিক্ত পুঁথিগত বলা হয়, তাহা এই প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা সম্পর্কেও অনায়াসে সমভাবেই প্রযুক্ত হইতে পারে। যে-সকল সংযুক্ত বর্ণ আরও তিন চারি বৎসর না শিখিলেও শিশুর কোন ক্ষতিই হয় না সেই সকল শব্দ শুধু সেই শব্দগুলিই শিখাইবার জন্য শিশুকে কণ্ঠস্থ করান হয়। জ্ঞানার্জনের এরূপ মনোবিজ্ঞান ও যুক্তিবিরুদ্ধ রীতি আর কী হইতে পারে? এই ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি অনুপযুক্ত শিক্ষকের হাতে আরও ত্রুটি-পূর্ণ এবং অনুপযুক্ত হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফলে শিক্ষার্থীর, শিক্ষার এবং তথা সমগ্র দেশের যে ক্ষতি প্রতিদিন সাধিত হইতেছে তাহা বলিবার নয়।

পূর্বেই দেখাইয়াছি বাঙ্গালাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে দুই প্রকার ছাত্র থাকে। একদল বর্ণজ্ঞানহীন, আর দল বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন। বর্ণজ্ঞানহীন শিক্ষার্থীদলকে সমস্ত বৎসর ধরিয়া ঐ এক বর্ণ পরিচয় করান হয়। ইহাতে একদল শিক্ষার্থীর অযথা একটি বৎসর অপব্যয় হয়। ইহাতে শিক্ষার্থীর

ক্ষতি, অভিভাবকের ক্ষতি, এই এক বৎসর কর্তৃপক্ষ প্রতি-ছাত্রের পিছনে যে অর্থ ব্যয় করিলেন তাহার হিসাবে কর্তৃপক্ষের ক্ষতি—এক কথায় সমস্ত দেশের জীবনে একটি বৎসরের ক্ষতি সঞ্চিত হইতে থাকে। এক বৎসর ধরিয়া শুধু বর্ণ শিখিবার প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষার রস চলিয়া যায়। এমনিতেই দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরক্ষরতার জীবন কাটাইয়া কী শিক্ষার্থী, কী তাহার অভিভাবক কেহই শিক্ষাকে এখন পর্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিতেছে না; মনে করিতেছে এতদিন ধরিয়া আমাদের বাপ-দাদার জীবন যদি লেখাপড়া না শিখিয়াই কাটিয়া গিয়া থাকে, তবে মাঠের হাটের ও ঘরের কাজের ক্ষতি করিয়া ছেলেমেয়েকে ইস্কুলে পাঠাইবার প্রয়োজন কী? তাই এই একবৎসরের ক্ষতি সমগ্র দেশের পক্ষে অনেক খানিই ক্ষতি। আর দেশের বাস্তব জীবনধারার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বলিয়া দুই কলম লেখাপড়া শিখিয়াই যে ছেলের দল বৃন্তচ্যুত হইতে থাকে এ দৃষ্টান্তও অভিভাবকদের সামনে আছে বলিয়া স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন জনসাধারণ শিক্ষাকেই দোষী সাব্যস্ত করিল। বুঝিতে পারিল না ইহা শিক্ষার ত্রুটি নহে; ইহা অশিক্ষা কুশিক্ষা বা বিকৃত শিক্ষার ফল। এবং বর্তমানের যে-শিক্ষা ছেলেদের তাহাদের বৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য করিয়া দিতেছে, পদ্ধতির ত্রুটির সঙ্গে আরও কয়েকটি ত্রুটি মিলিত হইয়া উহা বিকৃত শিক্ষা বা কুশিক্ষার পর্যায়েই স্থান পাইবে। এই বিপদ হইতে ছেলের দলকে রক্ষা করিতে হইলে বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিকে পরিবর্তন করিতে হইবে। ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা

বর্তমান শিক্ষার এই ত্রুটিকে সংশোধন করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় ছিল ; কিন্তু যতদিন পর্যন্ত ওয়ার্ধা পরিকল্পনা রূপ পরিগ্রহ না করিতেছে, ততদিন ইহারই মধ্যে একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা এখন প্রধানতঃ নির্ভর করে শিক্ষকের উপর। শিক্ষক এ কথা শিক্ষার্থীকে বুঝাইয়া দিবেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাসূচীতে যতটুকু শিক্ষা দেওয়া হয়, প্রত্যেক "মানুষের" ততটুকু জ্ঞান মানুষ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই প্রয়োজন। নিজের ভালমন্দ বুঝিবার, নিজের বাহিরের বিশ্বের সঙ্গে পরিচিত থাকিবার প্রকৃষ্ট উপায় শিক্ষা। কিন্তু কেবল এইরূপ মৌখিক উপদেশেই চলিবে না। শিক্ষাপদ্ধতিকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করিতে হইবে, যাহাতে শিক্ষা শিক্ষার্থীর কাছে রসাল ও প্রীতিকর হয়, তাহা করিতে হইবে ; যাহাতে বর্ণ-জ্ঞানলাভ করিতেই এক বৎসর কাটিয়া না যায়, যাহাতে অভিভাবক মনে না করেন যে অনর্থক ছেলেমেয়েগুলির সময় নষ্ট হইতেছে, যাহাতে কর্তৃপক্ষের টাকার সদ্‌ব্যয় বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যতগুলি সমস্যা আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিয়া আছে, সেই সবগুলির সমাধান একমাত্র ওয়ার্ধা পরিকল্পনাই করিতে পারে বটে ; কিন্তু যদি শিক্ষাকে শিশুর মনোবিজ্ঞানসম্মত এবং বহুলাংশে শিশুর আবেষ্টন অনুযায়ী করিতে পারা যায়, তবে অনেক সমস্যারই সমাধান হইবে। পৃথিবীর সকল উন্নতিপ্রয়াসী দেশই আজ শিশুর শিক্ষাকে এইভাবে পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছে। তাই বর্তমানে যে পদ্ধতিতে আমরা শিশুকে শিক্ষা দিতেছি

তাহার পরিবর্তে উহাকে শিশুর মনোবিজ্ঞান এবং বহুলাংশে আবেষ্টনগত করিতে হইবে। তাহা হইলেই পড়ার প্রতি শিশুর অনুরাগ হইবে, অনুরাগ জন্মিলেই মনোযোগ সহজ হইবে। আর জ্ঞানার্জনের প্রধান উপায় যে মনোযোগ তাহা তো জানাই আছে, অতএব তখন শিশুর পক্ষে শিক্ষা সহজ ও স্বভাবগত হইবে।

আমাদের দেশে বর্ণানুক্রমিক শিক্ষাপদ্ধতিই একমাত্র পদ্ধতি, কিন্তু অন্যান্য দেশে আরও তিন রকম পদ্ধতি চলিত আছে—(১) শব্দক্রমিক, (২) দ্বৈত পদ্ধতি এবং (৩) বাক্যক্রমিক।

শব্দক্রমিক—এই পদ্ধতি অনুসারে শিশুদের জানা শব্দগুলি বোর্ডে লিখিয়া তাহাদের ছবি দেখান হয়। তারপর সেই শব্দগুলি ভাঙ্গিয়া বর্ণে পরিণত করিয়া বর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয়।

দ্বৈত পদ্ধতি—এই পদ্ধতি অনুসারে একই রকম দেখিতে বর্ণগুলিকে এক একটি বিভাগে সাজান হয়। যথা—ব র ক ধ ঝ ঋ কিংবা অ আ ত ভ ইত্যাদি। প্রথম বিভাগের বর্ণগুলি প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হয়, তারপর সেই বর্ণগুলি দিয়া শব্দ প্রস্তুত করা হয়—যেমন বক ধর কর বধ রব কবর ইত্যাদি। যতগুলি শব্দ প্রস্তুত করা সম্ভব ততগুলি শব্দ শিক্ষা দেওয়া গেল। ইহার পর এই শব্দগুলি হইতে বাক্য তৈয়ারী করিতে হইবে—যেমন বক ধর, বধ কর, কবর কর ইত্যাদি। ইহার পর আর একটি বিভাগ লইতে হইবে। সেই বিভাগের বর্ণগুলি শিক্ষা দেওয়া হইয়া গেলে শব্দ ও বাক্য গঠনের সময় পূর্বের বিভাগে যে সকল বর্ণ শব্দ বা বাক্য শিক্ষা করা গিয়াছে, তাহার সাহায্য

লইয়া শব্দ ও বাক্য সম্পদকে বাড়াইতে হইবে। এইভাবে সকল বর্ণ শিক্ষা দিতে হইবে।

বাক্যক্রমিক—প্রচলিত বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি, শব্দক্রমিক পদ্ধতি অথবা দ্বৈত পদ্ধতি—প্রত্যেকটিই অংশ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে পূর্ণ বা সমগ্রের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ইহাতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত শিশুর সমস্ত মনোযোগ এক একটি পরিচ্ছিন্ন (single) ধ্বনি বর্ণ বা শব্দকে আয়ত্ত করার দিকে থাকে। বর্ণ শিক্ষার পর শিশু যখন শব্দ শিক্ষার স্তরে উন্নীত হয়, তখনও এক একটি ধ্বনি বা বর্ণ বুঝিয়া লইয়া তাহার পর সমস্ত শব্দটি আয়ত্ত করে। তাহারও পরে যখন শিশু বাক্য পড়িতে আরম্ভ করে, তখনও সমস্ত বাক্যটি একবারে পড়িয়া যাইতে পারে না, প্রত্যেকটি শব্দে এবং তাহা হইতে প্রত্যেকটি বর্ণে ভাঙ্গিয়া বাক্যটি পড়ে। এই স্তর পর্যন্ত শিশু পাঠ করে না, পাঠের কৌশল আয়ত্ত করে মাত্র। শিশুর সমস্ত মনোযোগ থাকে প্রতিটি শব্দ ও বর্ণ সঠিক উচ্চারণ করিতে পারিল কিনা তাহারই দিকে। বাক্যটির মধ্যে কি বলা হয়, তাহার সম্বন্ধে কোন ঔৎসুক্য বা চিন্তা শিশুর থাকে না। পাঠ করিবার এই পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে পাঠ্যবস্তুর অর্থ যেমন হৃদয়াঙ্গম হয় না, তেমনি সুষ্ঠুভাবে ও দ্রুত পঠনের এবং সেই একই সঙ্গে অর্থাৎ একটি বাক্য পাঠ করিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে উহার অর্থবোধ হওয়ার ক্ষমতা শিশু আয়ত্ত করিতে পারে না। পাঠ্যবস্তুর অর্থ না বুঝিয়া পড়িয়া যাইতে থাকায় উহার রস নষ্ট হইয়া যায় এবং ক্রমে মনোযোগ ব্যাহত হইতে থাকে।

অর্থবোধ ও সুষ্ঠু পঠনের সঙ্গে চক্ষু চালনা করিবার শক্তি—ইংরাজীতে যাহাকে বলে Eye movement, সেই শক্তির একেবারেই বৃদ্ধি হয় না।

বাক্যক্রমিক পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান সম্মত এবং প্রথমেই সমগ্রতা হইতে আরম্ভ করে। মানুষ যাহা কিছু করে বা ভাবে তাহার পশ্চাতে থাকে তাহার চিন্তা এবং এই চিন্তার মূল বা ইউনিট হইতেছে বাক্য। বাক্যের সাহায্য না লইয়া মানুষ কোন কিছুই ভাবিতে পারে না। শিশুর পক্ষেও ইহা পুরাপুরিই সত্য। যখন শিশু ভালভাবে কথা বলিতে শেখে নাই, দুই-একটা শব্দ মাত্র বলিতে পারে, একটি পুরা বাক্য পর্যন্ত যখন বলিতে পারে না, তখনও সে যে দুই একটি শব্দ উচ্চারণ করে তাহারও অন্তরালে একটি সমগ্র বাক্যের ভাবই থাকে। সে যখন 'মা' বলিয়া ডাকে তখন হয় সে বলে মা আমায় কোলে লও, নয় মা আমার কাছে এস ইত্যাদি। শিশু যখন ৫।৬।৭ বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ে আসে তখন সে রীতিমত কথা বলিতে পারে এবং বুঝিতেও পারে। তাই শিশুর পঠনও যে বাক্য দ্বারাই শিক্ষা দেওয়া সহজ ও স্বভাবগত, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। মনোবিজ্ঞান বলে যে একটিমাত্র শব্দ অনুধাবন করিতে যে সময়ের প্রয়োজন, একটি ছোট বাক্য অনুধাবন করিতেও ঠিক সেই সময়ই লাগে। অবশ্য সেই বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলির এবং বাক্যটির অর্থ শিশুর নিকট পরিচিত থাকা দরকার। বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অর্থবোধ এবং চক্ষুচালন ক্ষমতা একই সঙ্গে চলিতে

থাকে। এখানে প্রথমেই কতকগুলি বাক্য শিক্ষা দেওয়া হয়—এই বাক্যগুলি শিশুর পরিচিত আবেষ্টন হইতে পরিচিত শব্দ লইয়া গঠিত। শিশু যাহা কিছু দেখে, করে বা ভাবে—সেই সকলই সে বইএর পৃষ্ঠায় দেখে, শিক্ষাদাতার কাছে শোনে। তাই সে সহজেই সে-সব বুঝিতে পারে এবং দ্রুত আয়ত্ত করিতে পারে। প্রথম হইতেই বাক্যকে ইউনিট করার ফলে সে যখন পাঠের বিষয়বস্তু চিন্তা করে, তখন তাহার চিন্তার মধ্যে শৃঙ্খলা থাকে এবং সেইজন্যই যখন সে লিখিতে শিখিবে, তখন নিজের অন্তরের ভাবকে শুদ্ধ বাক্যের মধ্যে প্রকাশ করিতে পারিবে। যাহা বুঝিতে পারে, তাহাকেও প্রকাশ করিতে না পারা এবং শুদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারার রোগ আজকাল অনেক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের বক্তব্য এই যে বুঝিতে পারি, লিখিতে পারি না। অনেক বড় হইয়াও এ ত্রুটি অনেক ছাত্রছাত্রী সারাইতে পারে না। কিন্তু বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে প্রথম হইতেই শিক্ষা পাওয়ার ফলে, শিশুকাল হইতেই শিক্ষার্থী নিজের চিন্তাকে বাক্যে প্রকাশ করিতে পারিবে। শুদ্ধ ভাষায় প্রকাশ না করিতে পারার ফলে অনেকে যাহা বই পড়িয়া শেখে, পরীক্ষার খাতায় লিখিতে যাইয়া তাহার অর্ধেকই মাটি করিয়া দিয়া আসে কিংবা দুই একটা পাশ করিয়া বাহির হইবার পরেও অনেক ছেলেমেয়ে কোন ঘটনার বিবরণ লিখিয়া দিতে অনুরুদ্ধ হইলে ঘামিয়া উঠে, কিছুতেই তাহাদের অন্তরের ভাবকে প্রকাশ করিতে পারে না।

প্রথম হইতেই বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে শিক্ষা পাইলে এই ত্রুটি হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে। এবং শিক্ষার ব্যাপারে ইহা একটা মস্ত বড় লাভ।

বানান শিক্ষা করিবার উপায় হইতেছে স্মৃতি এবং চক্ষু দিয়া পরিষ্কার করিয়া দেখা। বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে প্রথম হইতেই বহুবার করিয়া পাঠ্যবস্তুটি দেখা ও শোনার ফলে শিশুর পক্ষে বানান শিক্ষা সহজ হইয়া আসে।

বাক্যক্রমিক শিক্ষা নূতন নহে। ইউরোপ ও আমেরিকাতে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতেই এই পদ্ধতি অনেক মনো-বিজ্ঞানবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীতে ডাঃ ডিক্রোলি-ই (Decroly) প্রথম এই পদ্ধতিটি কাজে লাগান।

শিশু যখন কথা বলিতে শেখে, তখন সে যে পদ্ধতিতে, যে নিয়মে শেখে, শিশু যখন কথা পড়িতে শিখিবে, তখনও সেই নিয়মেই শিখিবে—ইহাই স্বভাবগত নিয়ম এবং সেইজন্যই সহজ। শিশু কিভাবে কথা বলিতে শেখে? সে তাহার মা বাবা এবং চারিদিকে আর যাহারা থাকে, তাহাদিগের কথা শোনে। কখনও বা তাহার মা কিংবা অপর কেহ তাহাকে বার বার একটা কথা বলাইতে শেখায়। এইভাবে দীর্ঘ দিন ধরিয়া শুনিতে শুনিতে সে কথা বলিতে শেখে। বার বার শুনিতে শুনিতে যদি একটা ব্যাপার আয়ত্ত করা যায়—তবে বার বার দেখিতে দেখিতে আয়ত্ত করা যাইবে না কেন? শিশু যখন শুনিত, তখন সে অর্থহীন কথা শুনিত না, যে কথা শুনিত তাহার সঙ্গে সেই কাজ হইতে দেখিত,

নিজেও করিত। বাস্তব ঘটনার সঙ্গে তাহার শোনা-কথার এত সহজ সম্পর্ক থাকার জন্যই তাহার কথা শিখিতে অসুবিধা হয় না। ঠিক সেই নিয়মেই একটা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে অর্থ মিলাইয়া সে যদি বার বার একটা বাক্য দেখে এবং শোনে, তবে সে সেই বাক্যটিকেই বা আয়ত্ত করিতে পারিবে না কেন?—নিশ্চয়ই পারিবে—ইহা স্বভাবগত এবং মনোবিজ্ঞান-সম্মত।

তাই বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতির অনুযায়ী শিশুর জানা ব্যাপার লইয়া কয়েকটি বাক্য বার বার তাহাকে দেখাইয়া এবং মুখে সশব্দে আবৃত্তি করাইয়া শিশুকে পঠন শিক্ষা দিতে হইবে। যতই সে পঠনকার্যে অগ্রসর হইয়া যাইবে, ততই ক্রমে আবৃত্তির প্রয়োজন কমিয়া যাইবে। শিশু প্রথম হইতেই বইএর লেখার সাথে তাহার জ্ঞান বা চিন্তার সঙ্গতি খুঁজিয়া পাইবে বলিয়া সহজে বাক্যগুলি শিখিতে পারিবে এবং সেই জন্যই পাঠে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবে। যে পাঠ তাহাকে পড়ান হইবে, সেই পাঠের বিষয়বস্তুর সহিত আগে শিশুকে পরিচিত করিতে হইবে। প্রথম কয়েকটি পাঠ যাহা সে প্রত্যহ সর্বদাই দেখে বা করে এমন বিষয়বস্তু লইয়া রচিত হইবে। শিশু যখন কিছুটা পড়িতে শিখিবে তখন শিশু যতটা কল্পনা করিতে পারে—অর্থাৎ সদা সর্বদা দেখে না কিন্তু যাহা সে জানে কিংবা চিন্তা করিয়া বলিতে পারে, এমন কল্পনাপূর্ণ পাঠ দিতে হইবে। বাক্যগুলিকে শব্দে বা বর্ণে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ান একেবারে নিষিদ্ধ। সম্পূর্ণ বাক্যগুলিই শিশুকে বার

বার শুনাইতে হইবে, বোর্ডে লিখিয়া দিতে হইবে, কয়েকটি কার্ডে বাক্য কয়টি লিখিয়া আনিয়া সেগুলি শিশুকে পুনঃ পুনঃ দেখাইতে হইবে। কোন্ বাক্যটি কোন কার্ডে লিখিত আছে, বার বার দেখা ও শোনার ফলে শিশু তাহা অনায়াসেই বুঝিতে ও মনে রাখিতে পারিবে। তারপর কার্ডগুলি সমস্ত ইস্কুল ঘরটায় টাঙ্গাইয়া দিয়া এক একটি বাক্য বলিয়া এক একটি কার্ড শিশুকে শিক্ষক আনিতে বলিবেন। এইভাবে শিশু বাক্য শিখিতে থাকিবে। ইহার পর আর একটি পাঠের বাক্যও এইভাবে কার্ডে লিখিয়া, বোর্ডে লিখিয়া, বার বার সশব্দে বলিয়া শিশুকে শিক্ষা দিতে হইবে। এই বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকাতে আরও কতকগুলি বস্তুর সাহায্য লওয়া হয় এবং সেগুলি বাজারেই কিনিতে পাওয়া যায়। শিক্ষকের নিজের নিকট যেমন কতকগুলি লেখা কার্ড থাকে—প্রত্যেক শিশুকে দিবার জন্যও কতকগুলি কার্ড থাকে। সে চারি পাঁচটি কার্ড হইতে এক একটি বাক্যের কার্ড খুঁজিয়া পর পর সাজায়। ইহা ছাড়া পাঠের বিষয়বস্তুর অনুযায়ী ছবি প্রস্তুত করিয়া বিষয়বস্তুকে শিশুর নিকট আরও স্পষ্ট করা হয়। আমাদের দেশে বিদেশের মত এত বিভিন্ন বস্তুর সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার সুবিধা একেবারেই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমগ্র দেশের মঙ্গলকর এমন কোন নূতন পদ্ধতি যদি গ্রহণযোগ্য করিয়া তোলা যায়, তবে সেজন্য বিশেষ যত্নবান্ হওয়া উচিত। শিক্ষক কার্ডে যেমন বাক্যগুলি লিখিয়া আনিবেন, তেমনি বিষয়বস্তুর অনুযায়ী

ছবি আঁকিয়া আনিবেন। পাঠ্যপুস্তকে যে দুই চারিটা ছবি থাকে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়।

বিদেশে এই বাক্যক্রমিক শিক্ষাকেই এক একজন এক একভাবে শিশুদের নিকট উপস্থিত করিতেছেন। এ পর্যন্ত যেরূপ পদ্ধতির কথা আলোচনা করা গিয়াছে, তাহা ডাঃ ডিক্রোলীর মতানুযায়ী। তিনি বলেন, মাতা শিশুকে কতকগুলি আদেশ-সূচক বাক্য বলিয়া এবং সেই অনুযায়ী কাজ করাইয়া কথা বলিতে শিক্ষা দেন; অতএব পড়িতে শিখাইবার সময়ও সেই-রূপ আদেশসূচক বাক্য দ্বারা শিখাইতে হইবে। মিস লাডফোর্ড বলেন, ছন্দোবদ্ধ বাক্যই শিশুকে পড়া শিখাইবার পক্ষে সুবিধাজনক। তিনি তাঁহার বইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ক্রিসেন্ট মুন" (Crescent Moon) হইতে বাক্য লইয়া সেগুলির নানারঙের ছবি আঁকিয়া শিশুদের নিকট উপস্থিত করেন। তাঁহার কথা হইতেছে এই যে, একটি গদ্য বাক্য হইতে একটি ছন্দোবদ্ধ বাক্য অনেক বেশি ভাবপ্রকাশক এবং একটি সমগ্রভাবই শিশুর পক্ষে প্রয়োজন। এক একটি বাক্যেই এক একটি গল্প হয়, এমন অনেক বাক্য তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐগুলি কার্ডে লিখিয়া ছবি আঁকিয়া সে সকল গল্প শিশুদের মুখে বলিয়া, অভিনয় করিয়া নানাভাবে শিশুর নিকট উপস্থিত করেন। শিশুরা প্রথমে সেগুলি দেখিয়া আবৃত্তি করে, তাহার পর চোখ বুজিয়া আবৃত্তি করে, তাহার পর ঘরের মধ্যে নাচিয়া নাচিয়া যে-কোন সুরে সেগুলি গাহিতে থাকে। স্ব-স্থানে ফিরিয়া আসিবার পূর্বে তাহারা কার্ডের

মধ্যে যাহা লেখা আছে তাহা আবার দেখিয়া আসে। প্রতিদিন এক একটি নূতন গল্প বা ভাব তাহাদের দেওয়া হয় এবং ঘরের চারিদিকে সেগুলি টাঙ্গাইয়া রাখা হয়, যাহাতে শিশুরা যে-কোন সময়েই সেগুলি পাঠ করিতে পারে। মিস্ লাডফোর্ড সর্বদা বাক্যই পড়াইয়া যান। কখনও শব্দ বা বর্ণ বিশ্লেষণ করিয়া পড়ান না। তাঁহার মতে বাক্য পাঠে শিশু কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গেলে শিশুরা নিজেরাই শব্দ, বর্ণ ও ধ্বনি বাহির করিয়া করিয়া লইতে পারিবে—এজন্য অনর্থক সময় নষ্ট করা বাঞ্ছনীয় নহে।

ডাঃ জে হাবার্ট জেগার তাঁহার The Sentence Method of Teaching Reading বইতে এই বাক্যানুক্রমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শিশুর পক্ষে বাক্যদ্বারা শিক্ষা করাই সকলের অপেক্ষা সহজ পন্থা। তিনি বলেন পঠন শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য অল্প পরিশ্রমে দ্রুত পঠন আয়ত্ত করা এবং তাহা এই বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতিতে একমাত্র সম্ভব। তাঁহার মতে অনেকগুলি বাক্য শিক্ষা দেওয়ার পর বাক্য ভাঙ্গিয়া শব্দ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার মতে বর্ণ বিশ্লেষণ শিশুর পক্ষে কেবল অপ্রয়োজনীয় নয়, ক্ষতিকর। বর্ণ শিক্ষা অনেক পরে আসিবে অন্ততঃ বার বৎসরের পূর্বে নয়। তাঁহার মতে বাক্য শিক্ষার সময় প্রতি বাক্যের সঙ্গে ছবি দেখাইয়া শিশুর নিকট তাহার অর্থ সুস্পষ্ট করিতে হইবে এবং বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝা হইয়া গেলেই ছবি সরাইয়া আনিতে হইবে।

বাক্যক্রমিকপদ্ধতি কিজন্য মনোবিজ্ঞানসম্মত তাহা, ইহার সুফল এবং ইহার সম্বন্ধে বিদেশের মনোবৃত্তি সংক্ষেপে বর্ণনা করা গেল। বাক্যক্রমিকপদ্ধতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ; কিন্তু ইহা শিশুর নিকট উপস্থিত করিবার পন্থা সকলের সমান নয়। সেকথা পূর্বে বলিয়াছি। বর্ণমালা শিশুকে পৃথকভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধেও নানা মতভেদ আছে। মিস্ লাডফোর্ড ও ডাঃ জাগার বর্ণমালা শিক্ষা দিবার মোটেই পক্ষপাতী নন। মিস্ লাডফোর্ড বলেন, বর্ণ শিশুরা নিজেরাই শিখিবে, ডাঃ জাগার বলেন, বার বৎসরের পূর্বে বর্ণ শিক্ষা দিবার কোন প্রয়োজন নাই। বাক্যক্রমিক কিংবা অন্য কোনপ্রকার শিক্ষাপদ্ধতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমাদের দেশে বিশেষ গবেষণা হয় নাই বলা যায়। সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগের তত্ত্বাবধানে কয়েকটি গবেষণা হইয়াছে এবং প্রতিক্ষেত্রেই বাক্যক্রমিক পদ্ধতির কার্যকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসারে এযাবৎ বাংলা ভাষায় একটি মাত্র পুস্তক রচিত হইয়াছে। তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেণিংকলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু মহাশয়ের "ছোটদের পড়া।" এই "ছোটদের পড়া" এবং বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে রচিত একটি পুস্তকের সাহায্যে পঠন শিক্ষা দেওয়ার গবেষণা করিয়া বাক্যক্রমিক পদ্ধতিই যে শিশুমনের পক্ষে অধিক উপযোগী তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, সমান বুদ্ধিসম্পন্ন দুই শিশুদলকে একটি নিদিষ্ট সময় পর্যন্ত দুই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়ার পর বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে

শিক্ষাপ্রাপ্ত শিশুদল দ্রুত শিক্ষিত হইয়াছে। তাই মনে হয় বাঙ্গালাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে প্রচলিত বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতির পরিবর্তে বাক্যক্রমিক পদ্ধতি গ্রহণ করিলে অনেক সমস্যার সমাধান হইবে। অবশ্য ইহা দেশের দারিদ্রকে প্রত্যক্ষভাবে বুঝিতে পারিবে না সত্য এবং দুই কলম শিক্ষা পাইয়াই যে গ্রামের ছেলে পিতৃপিতামহের বৃত্তির প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন এবং শহর-মুখো হইয়া উঠে, তাহারও প্রত্যক্ষ সমাধান করিতে পারিবে না, কিন্তু বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে সর্বশুদ্ধ যতগুলি সমস্যা আছে, তাহার অনেকখানিই দূরীভূত করিতে সক্ষম হইবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে যতগুলি শিশু ভর্তি হয় চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত তাহার শতকরা ৮৫ ভাগই যে সরিয়া পড়ে এবং প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর এক অ, আ, ক, খ, শিখিতেই যে এক বৎসর সময় কাটিয়া যায়, গ্রামের ছেলেমেয়েরা যে শিক্ষার মধ্যে কোন রস পায় না—বাক্যক্রমিক পদ্ধতি গ্রহণ করিলে এ সকল সমস্যার যে অনেকাংশে সমাধান হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশের আবেষ্টনে এই বাক্যক্রমিক শিক্ষাকে কিভাবে প্রচলন করা যাইতে পারে—তাহা একটু বিচার করিয়া দেখা যাক্। অনেকের মতে প্রথম শ্রেণীতে কিছুদিন পর্যন্ত কোন পুস্তকের প্রয়োজন নাই। প্রথম কিছুদিন কতকগুলি বাক্য কার্ডে লিখিয়া, বোর্ডে লিখিয়া ছবির সাহায্যে পড়াইয়া যাইতে হইবে—কিছুদিন গেলে পর শিশুদের হাতে

পুস্তক দিতে হইবে। আমাদের দেশের পক্ষে এই ব্যবস্থার একটি প্রতিবন্ধক আছে। বাঙ্গালাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ অল্পশিক্ষিত। তাঁহারা নিজেদের বিবেচনামত কার্ড লিখিয়া ছবি প্রস্তুত করিয়া কতটা শিক্ষাদান কার্যে অগ্রসর হইতে পারিবেন—তাহা বিবেচনাসাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ বাঙলা ভাষায় বর্ণ ও বর্ণসংযোগ বেশি। এই এতগুলি বর্ণ ও বর্ণসংযোগকে আয়ত্তে আনিবার জন্য যেভাবে বাক্য সাজাইতে হইবে, তাহা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয় বলা চলিতে পারে। অতএব বাক্যক্রমিক পদ্ধতি অনুসারে পুস্তক রচনা করা একান্ত প্রয়োজন। সেই পুস্তকের মধ্যেই যত বেশি সম্ভব ছবি দিয়া ছবির সমস্যাও খানিকটা সমাধান করিয়া দেওয়া কর্তব্য।

বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে কি প্রণালী অনুযায়ী পুস্তক লিখিতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে নীচে দেওয়া গেল। (১) প্রথমেই বাক্যদ্বারা পাঠ আরম্ভ করিতে হইবে। (২) বিচ্ছিন্ন বাক্য পাঠে থাকিবে না; বাক্যগুলির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ থাকিবে। (৩) নূতন শব্দ অল্পে অল্পে এক একটি পাঠে প্রবেশ করাইতে হইবে এবং এক সাথে বেশি নূতন শব্দ থাকিবে না। (৪) এক একটি নূতন শব্দ অন্ততঃ চার পাঁচবার পুনরুল্লেখ করিয়া উহা শিশুর মনে গাঁথিয়া দিতে হইবে। যে সকল শব্দ বা বিষয়বস্তু ছাত্রছাত্রীর চিন্তা ও জীবনের সঙ্গে খাপ খায় না—সেই সকল শব্দ বা বিষয়বস্তু যত্নের সঙ্গে বাদ দিতে হইবে। ইহা ছাড়া এ পর্যন্ত যে-সব

আলোচনা করা গিয়াছে, পুস্তক রচনা করিতে তাহা হইতেও কিছু সাহায্য পাওয়া যাইবে।

কেবল পুস্তক লিখিলেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যাইবে না, শিক্ষকগণকেও বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া-রীতি শিখাইতে হইবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে-সকল শিক্ষক ট্রেণিং পাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেও এই নূতন পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া কেবল বইয়ের ভূমিকা পড়িয়া শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। ট্রেণিং ইস্কুলে মাঝে মাঝে রিফ্রেসার কোর্সের ব্যবস্থা হয়, দেখা গিয়াছে। গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটিতে এইরূপ রিফ্রেসার কোর্সের ব্যবস্থা করিয়া এই নূতন পদ্ধতিটি তাহাদের জানাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে খুবই সুবিধা হয়। আর অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা ভূমিকা ও পুস্তক অনুধাবন করিয়া অনেকটা আয়ত্ত করিতে পারিবেন, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

এই পদ্ধতিতে বর্তমান সময় অপেক্ষা শিক্ষককে অধিক খাটিতে হইবে। বর্তমানে শিশুকে অ, আ, ক, খ, এবং অজ, অথ মুখস্থ করিতে বলিয়া সেদিকে আর দৃষ্টি না দিয়াই তাঁহারা শিশু-শিক্ষা দিতে থাকেন,—এ অবস্থা নূতন পদ্ধতিতে চলিতে পারে না—সে কথা সত্য। বর্তমানের পরিমাণে কিছু বেশি খাটিতে হইবে বটে, কিন্তু সমস্ত কিছুর পরিমাপে তেমন বেশি কি পরিশ্রম হইবে? বিশেষতঃ যখন দেখা যাইবে যে শিশুরা তাহাদের পাঠে পূর্বাপেক্ষা দ্রুত অগ্রসর হইয়া যাইতেছে, তখন তাহারই আনন্দে সকল পরিশ্রম সার্থক হইবে। এক একটি পাঠ আয়ত্ত

করিতে শিশুদের যে সময় লাগিবে, তাহার মধ্যে প্রতি পাঠের কার্ড লেখা ও ছবি প্রস্তুত করা বিশেষ কষ্টকর নহে। অনেকে বলিতে চান যে বাক্যক্রমিক পদ্ধতিতে পাঠ দ্রুত অগ্রসর হয় না। কিন্তু অন্যান্য দেশের কথা বাদ দিয়াও বাঙ্গালাদেশে বাংলা ভাষার উপরেই যতটুকু গবেষণা হইয়াছে, তাহার ফল এই যে, এই পদ্ধতিতে পাঠ দ্রুত অগ্রসর হয়। শিশু একটি সমগ্র (whole) বাক্যের সাহায্যে অর্থবোধক পাঠ পড়িয়া প্রথম হইতেই পঠিত বস্তুর মর্ম গ্রহণে অভ্যস্ত হয়। তাই শব্দসম্পদ তাহার কম থাকিলেও সে যাহা পড়িতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিবে। অনেকগুলি শব্দ তো বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়—কিন্তু তাহা শিখিয়াও তো দেখা যায় যে, শিশু বাক্যপাঠ করিয়া বাক্যের মর্ম গ্রহণ করিতে পারে না।

নির্দোষভাবে পড়িবার জন্য তিনটি বিষয়ের প্রয়োজন হয়—চক্ষু চালনা করা, পাঠ্যবস্তুর মর্ম গ্রহণ করা এবং দ্রুতগতি। বাক্যক্রমিক পদ্ধতি এই তিনটিরই স্ফুরণ করিয়া নির্দোষভাবে পাঠ করিতে শিক্ষা দেয়। বিদেশের বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানবিদগণ ইহা প্রমাণ করিয়াছেন।

চক্ষু চালনা করা, পাঠ্যবস্তুর মর্ম গ্রহণ করা এবং দ্রুত পড়িবার ক্ষমতা আয়ত্ত করা—ইহার প্রত্যেকটির সাথে প্রত্যেকটির নিকট সম্পর্ক আছে। যে শিশু চক্ষু চালনা করিবার ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়াছে, সে দ্রুত পড়িতে শেখে এবং যে বেশ দ্রুত পড়িতে পারে তাহার পক্ষে পাঠ্যবস্তুর মর্মগ্রহণ করা সহজ হয় বলিয়া মনোবিজ্ঞানবিদগণ বলেন।

তাঁহারা বলেন যে, পাঠ্যবস্তুর মর্ম সহজে গ্রহণ করিতে হইলে এবং পাঠের গতি বাড়াইতে হইলে চোখকে দ্রুত চালনা করিতে হইবে। এক একবারে চোখ যতটা বেশি দেখিতে পাইবে—পড়ার গতি ততই বাড়িবে। কিন্তু বর্ণ এবং শব্দ হইতে পড়া আরম্ভ করিলে একসঙ্গে বেশি দেখিবার ক্ষমতা বাড়ে না। অন্য পদ্ধতিতে পড়ান শিক্ষা দিলে শব্দটি দেখিয়াই উহা পড়িয়া যাইতে পারে না জন্য গতি বাড়ে না। মনোবিজ্ঞানবিদগণের মতে এক একবারে চোখে বেশি দেখিতে হইলে প্রথম শিক্ষার্থীকে একই দৈর্ঘের ছোট ছোট বাক্য পড়িতে দেওয়া উচিত। তাহা হইলেই চক্ষু চালনা করিবার একটা পরিমিত মাত্রা শিশুকাল হইতেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

নীরব পঠন হইতে সশব্দে পড়িতে বেশি সময় লাগে। বয়স্কদের পক্ষেই একথা সত্য। কেননা চক্ষু উচ্চারণ ক্ষমতা হইতে দ্রুতগতিসম্পন্ন। সশব্দে পড়িবার সময় যে শব্দটা উচ্চারণ করিতেছি, চোখ সে শব্দ হইতে খানিকটা আগাইয়া যায়। প্রথম শিক্ষার্থী যে শব্দটি পড়িতে থাকে, তাহার দৃষ্টিও সেই শব্দটিতেই থাকে। কিন্তু দ্রুত পঠনের জন্য চক্ষু ও উচ্চারণের এই ব্যবধানটুকু বাড়াইয়া যাইতে হয়। সেজন্য নীরব পঠনই সুবিধাজনক এবং যে হেতু বড় হইয়া নীরবেই পড়িতে হইবে সেইজন্যও প্রথম হইতেই কিছু কিছু নীরব পঠন শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু একেবারে প্রথমেই নীরব পঠন চলিবে না—যতদিন পর্যন্ত উচ্চারণ শুদ্ধ না হইবে, ততদিন সশব্দেই

পড়াইতে হইবে। পাঠে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গেলে অল্প অল্প নীরব পঠন অভ্যাস করিতে হইবে। সশব্দে পাঠ করিলে পাঠ্যবস্তুর মর্ম গ্রহণে অসুবিধা হয় বলিয়া মনোবিজ্ঞানবিদগণ বলেন। যেহেতু পাঠশিক্ষার মধ্যে মর্ম গ্রহণ ক্ষমতা একটি মস্তবড় প্রয়োজনীয় কথা, সেই জন্য অল্পে অল্পে নীরব পঠন শিক্ষা দিতে হইবে।

শিশুর চক্ষু চালনা করিবার ক্ষমতা, পড়িয়াই মর্মবোধ করিবার ক্ষমতা এবং নীরব পঠনের অভ্যাস একই সঙ্গে বাড়াইতে হইবে এবং একই সঙ্গে বাড়াইতে হইলে যেমন বাক্যক্রমিক পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে তেমনি সেই বাক্যগুলিকে সহজ করিতে হইবে এবং শিশুর পরিচিত জগৎ হইতে লইতে হইবে, যাহাতে ঐ সকল বাক্য পড়িতে শিশুর কোন অসুবিধা বা শক্তিক্ষয় না হয়।

পড়ার গতি বাড়াইতে হইলে ঠোঁট নাড়িবার অভ্যাস কমাইতে হইবে। অনেক শিশুকে নীরব পঠনের সময়ও ঠোঁট নাড়িতে দেখা যায়—এই অভ্যাস একেবারে দূর করিতে হইবে। ঠোঁট নাড়িবার অভ্যাস এবং মনে মনে উচ্চারণ করিয়া পড়া দুইই দ্রুত এবং সুষ্ঠু পাঠের বিরোধী।

শব্দের নীচে আঙ্গুল রাখিয়া পড়িবার রীতি অযৌক্তিক। তাহাতে বিচ্ছিন্ন শব্দগুলির উপরই জোর পড়ে—বাক্যের মর্ম গ্রহণের দিকে নজর কমিয়া যায়। একটি কাগজের টুকরা দিয়া নীচের লাইনটা ঢাকিয়া পড়িবার অভ্যাস করাই সুযৌক্তিক।

যাহা হউক, বাক্যক্রমিক পদ্ধতির আলোচনা প্রসঙ্গে যে সকল কথা বলা হইল, তাহাতে পাঠের যে প্রধান প্রয়োজন পাঠের প্রতি মনোযোগ ও রসবোধ আকৃষ্টকরা সেই প্রধান প্রয়োজনই মিটিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। ইহা ছাড়া শিশু-শিক্ষার অন্যান্য সমস্যারও বহুল পরিমাণে সমাধান হইবে। তাই বাংলা পঠন শিক্ষায় এই বাক্যক্রমিক পদ্ধতি সর্বত্র গৃহীত হউক—ইহাই কামনা করি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবসর সময়ে হাতের কাজ

সাধারণতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারিটি ক্লাসে যত ছাত্র-ছাত্রী থাকে, বিদ্যালয়ের গৃহে তাহাদের সংকুলান হয় না বলিয়া এবং চারিটি শ্রেণী একসঙ্গে পড়ান অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় বলিয়া অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের প্রথম যুগ হইতেই দুইটি ভাগে ছাত্রছাত্রীদের ভাগ করিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। প্রথম শ্রেণী দশটা হইতে সাড়ে বারটা পর্যন্ত, আর দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী একটা হইতে সাড়ে চারটা পর্যন্ত, পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া স্থানের সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে এবং সেইসঙ্গে পড়াইবারও সুব্যবস্থা হইয়াছে। কয়েকটি জেলার বার্ষিক বিবরণী হইতে দেখা যায় যে সাধারণতঃ প্রথম শ্রেণীতে অর্ধেক ছাত্রছাত্রী থাকে, আর দ্বিতীয়, তৃতীয়,

ও চতুর্থ শ্রেণীতে বাকি অর্ধেক থাকে। তাই সমস্ত ছাত্রছাত্রীর সমষ্টিকে দুইভাগে ভাগ করিয়া পড়াইলে সব দিক দিয়া সুবিধা হয়।

কিন্তু গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের তথা জনসাধারণেরই সময়-বোধ বিশেষ নাই। ইস্কুল-কলেজ অফিসের মত একটি নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছাইতেই হইবে, তাহাদের মধ্যে এমন প্রয়োজন ঘটে না। তাই গ্রামের ছেলেমেয়ের স্কুলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া পৌঁছান প্রায় হইয়া উঠে না। যাহাদের দশটায় আসিবার কথা তাহারা দেরি করিয়া আসে, যাহাদের একটায় আসিবার কথা তাহারা অনেকে আবার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই আসিয়া পড়ে। ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ড প্রদত্ত যে ঘড়িটি প্রধান শিক্ষকের কাছে থাকে তাহা যে ঠিকভাবেই চলে তাহাও নয়। যে সকল ছেলেমেয়ে পিতামাতাকে মাঠের কিংবা অন্যান্য কাজে সাহায্য করিতে পারে, তাহাদের পিতামাতা তো তাহাদের যথাসময়ে ইস্কুলে পাঠান প্রয়োজন বোধ করেন না। তাহাদের কাছে কিছু সহায়তা না পাইয়া ইস্কুলে পাঠান তাঁহারা মোটেই সুনজরে দেখিতে পারেন না। যাঁহারা লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন তাঁহারাও আবার কাজের ঠেকায় কিংবা সময়-জ্ঞানের অভাবে ছেলেমেয়েদের যথাসময়ে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে পারেন না। দশটার সময় প্রথম শ্রেণী আরম্ভ হইবার কথা কিন্তু একদিকে পিতামাতা অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীর দল মনে করে দশটার সময় তো আর ক্লাস আরম্ভ হয় না, এক-সময়ে গেলেই হইবে; অন্যদিকে শিক্ষকের দল মনে করেন

ছাত্রছাত্রীরা তো আর দশটায় আসিবে না—এইভাবে নিয়ম ভঙ্গ হইতে থাকে। যাহাদের একটায় আসিবার কথা, তাহাদের মধ্যে অনেকেই মনে করে প্রথম শ্রেণীর পড়া যখন আরম্ভ হইয়াছে, তখন আমাদের ক্লাস আরম্ভ হইতে আর বেশি বাকি নাই, কিন্তু এই বেশি বাকি বলিতে যে কত-টুকু সময় বুঝায় তাহা তাহাদের জানা নাই। তাই তাহারা নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বে বিদ্যালয়ে চলিয়া আসে এবং উদ্বৃত্ত সময়টি বৃথা কাটায়। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর যে সকল ছাত্রছাত্রী আগেই আসিয়া পড়ে, তাহারা খাইয়া আসিয়াই খেলিতে আরম্ভ করে বলিয়া কিছুটা শ্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহার পর যখন পড়া আরম্ভ হয় তখন ঐ শ্রান্ত দেহে অল্পক্ষণ পড়িবার পরই তাহাদের অবসাদ আসে। ইহার ফলে দৈনিক যতটা পড়ান উচিত, ততটা পড়ান শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হয় না। ওদিকে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাও বাহিরের খেলা দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিবার দরুণ তাহাদের নির্দিষ্ট পড়াও হইতে পারে না। এইভাবে যথাসময়ের পূর্বেই বিদ্যালয়ে আসিবার দরুণ প্রথমশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রেণীরও ক্ষতি হইতে থাকে। শুধু পড়ার ক্ষতিই নয়, অসময়ে খেলা ও তৎসংশ্লিষ্ট অবাধ উত্তেজনার দরুণ ছাত্রদের স্বভাব চরিত্রেরও অবনতি ঘটিয়া থাকে। এই সমস্যার সমাধান কি করিয়া হইতে পারে ?

ছাত্র ও অভিভাবকদের মধ্যে সময়জ্ঞান সহসা জন্মান যাইতে পারে না। এবং যতদিন পর্যন্ত না ছাত্র এবং অভিভাবক উভয়েই লেখাপড়ার উপযোগিতা বুঝিবে এবং উহাকে

প্রাণের মধ্যে ভাল লাগাইতে পারিবে, ততদিন পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বা পরে আসা বন্ধ করিতে পারিবে না। তাই যে-ছাত্রছাত্রীর দল নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে আসিয়া পড়ে, তাহাদের ঐ সময়টুকু সুন্দরভাবে ব্যয় করিবার কোন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে কিনা সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। শিক্ষক কিভাবে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করিতে পারেন, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

ছাত্রছাত্রীর দল সাধারণতঃ কয়েকটি ভাগে ভাগ হইয়া খেলিতে থাকে। ঐ সময় বাহিরের রৌদ্রে ছুটাছুটি করতে দেওয়া অপেক্ষা তাহাদিগকে ঘরে বসিয়া খেলার ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ঘরে বসিয়া চারিজনের বেশি একত্র খেলিতে পারে এমন কোন সুবিধাজনক খেলা নাই; আর বিদেশী যে সকল ঘরে বসিয়া খেলার পন্থা রহিয়াছে একমাত্র ব্যয়বহুলতার জন্যই তাহাদিগকে প্রথমেই বাদ দেওয়া যাইতে পারে। চল্লিশ-জন ছাত্রছাত্রীকে খেলা জোগাইতে হইলে প্রতি ভাগে চারিজন করিয়া দশটি খেলার ব্যবস্থা করিতে হয়। এত খরচ করা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। আর এরূপ দেশী খেলা ভাল না থাকায় আমাদের দেশের অজ গ্রামগুলির মধ্যে কতকগুলি বিদেশী ব্যয়বহুল খেলার প্রচলন করানকে সমর্থন করা যাইতে পারে না। তাহা হইলে কি করা যাইতে পারে?

আমাদের মনে হয় যদি উহাদের জাতীয় বৃত্তিমূলক এমন কোন কাজে ব্যাপৃত রাখা যায় যাহাতে নিয়মানুবর্তিতাও থাকে

এবং সেই সঙ্গে উহাদের সৃষ্টি ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়, তবে সবদিক দিয়াই মঙ্গলজনক হয়। কোন কিছু সৃষ্টি করিতে পারার মধ্যে যে আনন্দ, ঐ কাজের ফলে তাহারা সেইরূপ আনন্দও পাইবে। কয়েকটি বিশেষ জিনিসের প্রস্তুত প্রণালী শিখিয়া তাহারা লাভবানও হইবে। বাড়ীতেও তাহারা সেগুলি তৈরি করিয়া পিতামাতা অভিভাবককে সাহায্য করিতে পারিবে। এমন কী সহজ কাজের পরিকল্পনা করা যাইতে পারে?

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাসূচীতে হাতের কাজ বলিয়া একটা বিষয় আছে। কিন্তু এই হাতের কাজের কোন পরীক্ষা হয় না বলিয়া এ বিষয়ে কি শিক্ষক, কি শিক্ষার্থী, কেহই বিশেষ মনোযোগ দেয় না। ফলে বিশেষ কোন হাতের কাজ শিক্ষার্থীরা স্বভাবতঃই শিখিবার সুযোগ পায় না। কাগজের এরোপ্লেন, দোয়াত, টুপী ইত্যাদি বানাইয়া সে সময়টা কাটাইয়া দেয়। তাহাদের আনন্দ উপভোগের প্রবৃত্তিকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া কৌশলে তাহাদিগকে কাজের জিনিস তৈয়ারী করা শিখাইয়া দেওয়া অসম্ভব নহে। ওয়ার্ধাপরিকল্পনা অনুযায়ী হাতের কাজের মধ্য দিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আমাদের দেশে কবে সম্ভব হইবে জানি না। কিন্তু বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে অবসর সময়ে যদি কোন প্রকার লাভজনক ও বৃত্তিমূলক কাজ ছাত্রদের দিয়া করান যায় তবে অনেক সুবিধা হয়। ওয়ার্ধাপরিকল্পনাতে হাতের কাজের মধ্য দিয়াই অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে কিন্তু তাহার অনুপস্থিতিতে লেখাপড়ার সঙ্গে কাজ করিয়াও কি ছাত্র কি

অভিভাবক উভয়েই উপকৃত হইতে পারে। ছাত্ররা কোন একটি বিশেষ বৃত্তি শিখিতে পারিবে এবং যে সকল অভিভাবক দেখিতেন যে লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহাদের ছেলেরা নিজেদের জাতিগত ব্যবসায়ে অমনোযোগী হইয়া পড়ে, শহরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হয়, অভিভাবকদিগকে তাহাদের কাজে সাহায্য করিতে চায় না, তাঁহারাও দেখিবেন যে সেই লেখাপড়ার মধ্যেই লাভজনক ও বৃত্তিমূলক কাজও শিখান হইয়া থাকে। তখন লেখাপড়া সম্বন্ধে যে তাঁহাদের একটি ভীতি আছে, তাহা দূর হইবে। তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন শহরে যাইয়া চাকুরী করিবার জন্যই এই লেখাপড়া শেখান হয় না; নিজেদের আবেষ্টনে থাকিয়াই নিজেরা যাহাতে মানুষের মত জীবন যাপন করিতে পারে, নিজেদের কাজ সম্পর্কেই নিজেদের বুদ্ধি যাহাতে বাড়িয়া যায়, নিজেদের গণ্ডী ছাড়াইয়া নিজেদের দৃষ্টি যাহাতে প্রসার লাভ করে, এই সকল উদ্দেশ্য লইয়াই লেখাপড়া শেখানর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আজ অনুপস্থিত ছাত্রকে ডাকিতে গেলে অভিভাবককে এমনও বলিতে শোনা যায় যে "বলিয়া দে আজ তোর পেটের অসুখ হইয়াছে। আজ মাঠে গরু লইয়া যাইতে হইবে, আজ ইস্কুলে যাইয়া কাজ নাই।" কিংবা "আমার ছেলে যে দিন খুশি পরীক্ষা দিয়া পাস করিবে, তাহার জন্য এত তাড়া কিসের?" কিন্তু যদি তাঁহারা দেখিতে পান যে ছেলেরা লেখাপড়ার সঙ্গে কাজও শেখে, তবে ইস্কুলে ছেলে পাঠাইতে তাঁহারা আরও মনোযোগী হইবেন। চাকুরী না করিলেও চাষীর ছেলের কৃষিকাজের জন্যই যে সাধারণ ভাবে

লেখাপড়ার আজ দরকার, এ কথাটা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

কি কি বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাহার কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে সে বিষয়ে স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী শিক্ষকদের ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে। এখানে শ্রেণী হিসাবে দল বা বৃত্তির ভাগ হইবে না। যে ছাত্রের যে বৃত্তি ভাল লাগে কিংবা যে বৃত্তি অভিভাবকের ব্যবসায়ের সঙ্গে অধিক সংশ্লিষ্ট কিংবা যাহা করিবার পক্ষে ছাত্রের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সুবিধা আছে তাহাতেই ছাত্রকে উৎসাহ দিতে হইবে। প্রত্যেকটি ছাত্রকে চারি পাঁচটি বৃত্তিই শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়; তাহাতে সময়েরও সংকুলান না হইতে পারে এবং অর্থেরও প্রয়োজন বেশি হইয়া পড়িতে পারে। সহজ কতকগুলি হাতের কাজ যাহা ছেলেরাও কমবেশি জানে এবং সকল প্রাথমিক শিক্ষকই জানেন সেই সকল কাজই করা সুবিধা; তাহা না হইলে অভিজ্ঞ শিক্ষকেরও যেমন প্রয়োজন, অধিক অর্থেরও তেমন প্রয়োজন। নিম্নলিখিত এই বৃত্তিগুলি ছাত্রেরা শিখিতে পারে—(১) বাঁশের নানাবিধ কাজ, যথা মোড়া তৈয়ার, বাঁশের ঝুড়ি, চালুন, পলো ইত্যাদি, (২) সুতাকাটা, (৩) জাল তৈয়ার, (৪) ফল ও সব্জী উৎপাদন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেয়েরাও এই সঙ্গে এই কাজই করিতে পারে। তাছাড়া সেলাই করা তাহাদের শেখান যায় কিনা সে কথাও বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, কিংবা শিশু সাধারণতঃ জামা গায়ে দেয় না।

তথাপি শীতের দিনে প্রয়োজন হইয়াই থাকে। যেখানে সেলাই শিক্ষা দিবার সুবিধা থাকে, যেমন সেলাই জানে এমন দুই একটি মেয়ে যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় কিংবা যদি বিশেষ শিক্ষকের সেলাই সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে, তবে মেয়েদের মধ্যে ইহা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

অন্য যে সকল বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছি, সেগুলি সকল শিক্ষকই জানেন। যাঁহারা ট্রেণিং পাস শিক্ষক তাঁহারা তো ট্রেণিং স্কুলে সেগুলি যথাযথ শিক্ষা করিয়াই আসেন; আর যাঁহারা ট্রেণিং পাস করেন নাই তাঁহারাও ঐ সকল বাঁশের কাজ, সুতাকাটা, জাল বোনা কিছু না কিছু জানেনই। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষকই ট্রেণিং পাস করা থাকেন। ট্রেণিং স্কুলে ঐ সকল হাতের কাজ করিয়া আসিয়া তাঁহারা যদি তাঁহাদের ছাত্রদের শুধু কাগজের এরোপ্লেন, দোয়াত ও ফুল তৈরী শিক্ষাদানেই নিযুক্ত থাকেন তবে ঐ সকল শিখিবার প্রয়োজন কি? অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস হয় এবং অধীত বিদ্যা কাজে না লাগাইলে বিদ্যাশিক্ষার সার্থকতা কোথায়?

কি করিয়া ছাত্রদের উহা শিখান যাইতে পারে? যে স্কুলে তিন জন শিক্ষক থাকেন, সেই স্কুলে, প্রথমশ্রেণীর জন্য দুইজন শিক্ষক পুরাপুরি কাজ করিয়া অপর একজন শিক্ষক কিছুটা সময়ের জন্য দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে ইহা শিক্ষা দিতে পারেন। এই সকল শ্রেণীর ছাত্রেরা অন্ততঃ সাড়ে এগারটার পূর্বে বিশেষ আসিবে না, তাই সাড়ে এগারটা

হইতেই হাতের কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। যিনি হাতের কাজ শিক্ষা দিবেন তিনি সাড়ে দশটা হইতে সাড়ে এগারটা পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীতে পড়াইয়া বাকি সময়টুকু হাতের কাজ শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে পারেন। এই শিক্ষকাজ স্কুলঘরের বাহিরে গাছ তলায় করিতে হইবে, তাহা হইলে প্রথমশ্রেণীর বালকদের কোন অসুবিধা হইবে না। পূর্বেই বলিয়াছি শ্রেণী অনুসারে দল বা বৃত্তিবিভাগ হইবে না। যে ছাত্র যে বৃত্তিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিবে, সেই ছাত্রকে সেই বৃত্তিতে যোগদানের সুযোগ দিতে হইবে। কেননা ছাত্র যে বৃত্তিতে মনোযোগ দিবে, তাহার সঙ্গে তাহার একটি সহজ পরিচয় আছে ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। হয় সে নিজেই উহার প্রতি বিশেষ মনোযোগী কিংবা অভিভাবকের জাতব্যবসার সঙ্গে উহা সংশ্লিষ্ট কিংবা কুটীরশিল্প হিসাবে গ্রামের আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে সে উহা শিখিয়াছে। সেজন্য সুবিধা এই যে শিক্ষকের অতি অল্প ইঙ্গিতেই সে কাজে অগ্রসর হইয়া যাইতে পারিবে। এখানে শিক্ষকের কাজ প্রধানতঃ ছাত্রদের কয়েকটি দলে ভাগ করিয়া উহাদের মধ্যে বৃত্তি বাছিয়া দেওয়া এবং কাজের নির্দেশ দেওয়া। ছাত্রেরা নিজ নিজ কাজে যাহাতে বিশৃঙ্খলা না করে এবং কোনপ্রকার গোলযোগের সৃষ্টি না করে শিক্ষককে প্রধানতঃ তাহাই দেখিতে হইবে। হাতে কলমে প্রথমে তাঁহাকে কিছু দেখাইতে হইবে বটে কিন্তু তাহা খুব বেশি নয়। প্রত্যেক দলের মধ্যে যে ছাত্র এ সকল কাজে একটু বিশেষ জ্ঞান রাখে তাহাকে দলনেতা করিয়া দিয়া সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া গেলেই চলিবে।

যে বিদ্যালয়ে দুইজন শিক্ষক, সেখানে একজন শিক্ষক সবটা সময় প্রথমশ্রেণীতে পড়াইয়া আর একজন এক ঘণ্টা সময়ের জন্য হাতের কাজ শিক্ষাদানের কাজে যাইতে পারেন। কোন কোন শিক্ষাবিদ এ বিষয়ে আপত্তি তুলিতে পারেন। তাহারা হয়তো বলিবেন বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম শ্রেণীই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অতএব প্রথমশ্রেণীর শিক্ষার প্রতিই অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত। তাই প্রথমশ্রেণীর অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া হাতের কাজ শিখাইতে যাওয়ার মধ্যে যুক্তি নাই। কথাটি খাঁটি বটে। কিন্তু হাতের কাজ শিক্ষা দিতে যাইয়া অপর শিক্ষক যতক্ষণ অনুপস্থিত থাকিবেন, ততক্ষণ ঐ একজন শিক্ষকই প্রথমশ্রেণীর অধ্যাপনা কার্য পরিচালনা করিবেন। যে বিদ্যালয়ে দুইজন শিক্ষক আছেন, সেখানে তো দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে প্রতি শিক্ষককে কোন কোন সময় একসঙ্গে দুইটি শ্রেণী পড়াইতে হয় এবং স্কুলবোর্ড কর্তৃক ইহা অনুমোদিতও বটে। তাই প্রথমশ্রেণীতে অল্প সময়ের জন্য একজন শিক্ষক পড়াইতে পারিবেন না কেন? সাড়ে এগারটা পর্যন্ত দুইজন শিক্ষক পড়াইয়া আর একজন যদি বাকি সময়টুকুর জন্য হাতের কাজ শিক্ষা দিতে আসেন, তবে কি খুব ক্ষতির কারণ হয়? তাহা ছাড়া হাতের কাজের শিক্ষককে যে সকল সময়েই সেখানে বসিয়া থাকিতে হইবে, তাহাও নহে। ছাত্রদের কাজ গুছাইয়া দিয়া তিনি আবার প্রথম শ্রেণীতে চলিয়া আসিতে পারেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সকল ছাত্রছাত্রীই আগে আসিয়া জড় হইবে না—অল্পসংখ্যক ছেলেই হয়তো

সেখানে থাকিবে। আর পূর্বে যে ভাবে "দলনেতা" করা গিয়াছে, সেই দলনেতারাই কার্য পরিচালনা করিয়া লইতে পারিবে।

কিন্তু যে বিদ্যালয় মাত্র একজন শিক্ষকের পরিচালনার অধীন, অসুবিধা সেখানে কিছু বেশি সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমান সময়ে এইরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুব কম। এবং এখানেও বোধ হয় হাতের কাজের সুযোগ করা যাইতে পারে। এইরূপ ইস্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পঞ্চাশের নীচে, তাই প্রতি শ্রেণীতে খুব অল্পই শিক্ষার্থী থাকে। এ অবস্থায় শিক্ষক প্রথম শ্রেণীতে অঙ্ক কিংবা হাতের লেখা দিয়া অল্প সময়ের জন্য হাতের কাজের শিক্ষায় যাইতে পারেন। হাতের কাজে পটু ছাত্র-নেতাদের কাজ দেখাইয়া তিনি আবার চলিয়া আসিতে পারিবেন।

এইভাবে হাতের কাজ শেখানতে ছাত্রছাত্রীরা কিরূপ উপকৃত হয়, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। ইহা শিক্ষার্থীদের উদ্বৃত্ত সময়টুকু যেমন সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করিতে শিক্ষা দেয়, তেমনি ভবিষ্যতের পথও পরিষ্কার করে। এইবার দেখা যাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ইহা কি উপকার করিতে পারে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন যৎসামান্যই সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এজন্য তাঁহাদিগকে অন্যভাবে রোজগারের পথ দেখিতে হয়। তাহা দেখিতে যাওয়ার ফলে তাহারা দশটায় ইস্কুলে উপস্থিত হন না, সাড়েচারিটা পর্যন্ত ইস্কুলে থাকেন না, পড়ায় গাফিলতি করেন, কখনও বা পরস্পরের

মধ্যে ব্যবস্থা করিয়া ইস্কুলে একেবারে অনুপস্থিত হন। কিন্তু তাঁহারা যদি ছাত্রদের এইভাবে হাতের কাজ শিক্ষা দেন, তবে তাঁহাদের নিজেদেরই কিছু লাভ হইতে পারে। বাঁশের নানা কাজ, জাল বোনা, সুতা কাটা, শব্জী করা কাজে যদি শিক্ষক নিজের পকেট হইতে সাহায্য করেন, তবে সেই মূলধন হইতে যাহা আয় হইবে তাহাকে একেবারে যৎসামান্য বলা চলিতে পারে না। একটা দুই আনা দামের বাঁশ হইতে এবং আট আনার বেত হইতে চারিটি মোড়া অনায়াসে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এবং এই দশ আনার খরচে যে চারিটি মোড়া প্রস্তুত হইল তাহা নিকটস্থ বাজারে অনায়াসে তিন টাকায় বিক্রয় করা যাইতে পারে; আটটি ছাত্র দুইদিন এক ঘণ্টা করিয়া খাটিলেই অনায়াসে চারিটি মোড়া প্রস্তুত হইতে পারে। এইভাবে এক-মাসে তাঁহারা মন্দ লাভবান হইবেন না।

এইখানে একটি কথা আছে। ছাত্ররা দীর্ঘদিন এইভাবে কাজ করিতে রাজি না হইতে পারে। যাহাতে তাহাদের ভবিষ্যৎ উপকার করে শুধু তাহাতে তাহারা দীর্ঘদিন রস না পাইতে পারে। এজন্য এমন ব্যবস্থা করা যায় যে মাঝে মাঝে ছাত্ররাই বাঁশ, বেত আনিবে, মোড়া বোনা হইলে তাহারাই উহা লইয়া যাইবে এবং বাড়িতে দরকার না থাকিলে বাজারে বিক্রয় করিয়া দিবে। নিজেদের সৃষ্টির ফল লাভ করিয়া তাহারা হাতের কাজে আরও উৎসাহ পাইবে। আরও একটা ব্যবস্থা করা যায়; ইস্কুলে একটি সমবায় সমিতির মত করিয়া ছাত্রদের প্রস্তুত ঐ সকল দ্রব্যাদির বিক্রয়লব্ধ টাকা সেই সমবায় সমিতির

নামে রাখিয়া সেই টাকা পরবর্তী হাতের কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে কিংবা বিদ্যালয়ের অন্যান্য মঙ্গলকাজেও খরচ করা যাইতে পারে।

বিদ্যালয়ে অসময়ে আগত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের সময়টা সদ্ব্যবহার করিবার এই প্রস্তাব কতদূর সফল হয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এই ইচ্ছাতেই এই প্রস্তাব করিলাম। একদল শিক্ষার্থী বহুপূর্বে বিদ্যালয়ে আসিয়া নানাপ্রকার দুষ্টামি ও কুকাজ করিয়া অনিষ্টকর প্রবৃত্তিগুলিকে সর্বদা জাগ্রত করিয়া রাখিতেছে; তাহাদের উঠতি বয়সের সেই শক্তিটিকে যদি গঠনমূলক প্রবৃত্তিতে পরিণত করা যায়, তবে দেশের এবং দশের খুবই উপকার হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে দুর্দশাগ্রস্ত সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যাঁহারা, সেই শিক্ষকেরাই সবচেয়ে উপদ্রুত। তথাপি জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রক্ষার ভার তাঁহাদেরই হাতে। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়া যাঁহারা দেশের সেবা করিলেন, এই শিক্ষকেরা তাহাদের অপেক্ষা কম সেবা করেন না। সমস্ত দেশবিদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে এই সমস্ত অসুবিধাকে বরণ করিয়া লইয়া তাঁহারাই জাতিকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। আমাদের শিক্ষকদেরও সে কথা মনে রাখিয়া কাজে নামিতে হইবে। তাঁহাদের পথে বাধা প্রচুর, কিন্তু সে বাধা জয় করিয়া চলিতে হইবে কেবল আদর্শের জোরে।

আরও একটি কথা সংক্ষেপে বলিব—। এ অভিযোগ শুনা যায় যে মিশনরীগণ আমাদের দেশেই দেশীয় স্কুলগুলি অপেক্ষা ভাল কাজ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আরও গর্বের কারণ এই যে, যে সকল লোক এদেশে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয় তাহারা সাধারণতঃ সমাজের নিম্নশ্রেণীর। কিন্তু মিশনরীগণ সেই নিম্নশ্রেণীদেরই যে ভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলেন আমরা তাহার কিছুই পারি না কেন? একথা সত্য বটে যে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অপেক্ষা মিশনরী স্কুলগুলি নানাভাবে সাহায্য পাইয়া থাকে। তাহাদের টাকা পয়সাও বেশি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও একথাও অস্বীকার করা যায় না যে মিসনরীদের কর্মের পিছনের উদ্দেশ্য বা প্রেরণা যাহাই হউক না কেন, তাঁহারা যাহাকে আদর্শ হিসাবে একবার গ্রহণ করেন তাহার প্রতি তাঁহাদের একটা নিষ্ঠা থাকে। সেই নিষ্ঠাই তাঁহাদিগকে কর্ম নৈপুণ্য দান করে। সেইজন্য যে কোন কাজ তাঁহারা গ্রহণ করেন, নৈপুণ্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাহা সম্পাদন করেন। আমাদের দেশে ঐরূপ আদর্শনিষ্ঠা, কর্মের প্রতি ঐরূপ নৈপুণ্য আজ একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশে শিক্ষকগণ সকল দুর্যোগ সহ্য করিয়া ঐরূপ নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিবেন—ইহাই সমস্ত জাতি আশা করে।

ওয়ার্ধা-শিক্ষা-পরিকল্পনা।

আমাদের জাতীয় জীবনব্যবস্থার সহিত খাপছাড়া, অকার্যকরী, পুঁথিগত, নিশ্চল, বুদ্ধিপ্রধান ও বিদেশী মনোভাবাপন্ন বর্তমান প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা যে আমাদের কিছুই দিতে পারে না ইহা বুঝিতে পারিয়া মহাত্মা গান্ধী একটি শিক্ষা-ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। ইহা ওয়ার্ধা-শিক্ষা-পরিকল্পনা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার ব্যবস্থা আমাদের বর্তমান আবেষ্টনকে ভিত্তি করিয়া রচিত এবং আমাদের জাতীয় জীবনের সার্থকতা দানের উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। ইহা আমাদের কর্মশক্তিকে ফুটাইয়া তুলিয়া আমাদিগকে শক্তিমান করিবে, ইহা কর্ম বুদ্ধি ও হৃদয়কে একই সঙ্গে পরিচালিত করিয়া আমাদিগকে মানুষের মত "মানুষ" করিবার জন্য পরিকল্পিত। লক্ষ লক্ষ নিরন্ন, অর্ধাহারী ও উলঙ্গ ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ লক্ষ্য করিয়া ইহা রচিত। প্রত্যেক মানুষই কমবেশি সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সেই সৃষ্টিশক্তিকে জীবনের কর্ম চিন্তা ও আনন্দে বিকাশ করিতে পারাই জীবনের সার্থকতা। এই ক্ষমতা বিকাশলাভের পথ পাইলে মানুষের জীবন আনন্দে ভরিয়া উঠে—মানুষকে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে সুন্দর করে। কিন্তু মানুষের অন্তর্নিহিত এই সৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হইলে জীবন ক্লেদে ভরিয়া যায়। এই শক্তির বিকাশ করাতেই শিক্ষার প্রয়োজন। গান্ধীজী তাঁহার শিক্ষাব্যবস্থায় জীবনের এই সৃষ্টিশক্তির বিকাশের সুযোগ রাখিয়াছেন।

ওয়ার্ধা শিক্ষাপরিকল্পনার মূল কথা হইতেছে এই যে ইহা কোন একটি শিল্প (craft) কে অবলম্বন করিয়া দেওয়া হয়। উহা এমন কিছু প্রস্তুত করে যাহা বাজারে বিক্রয় করা চলে, কেবল খেলার জিনিস হয় না। কোন একটি শিল্পের সাহায্যে তাহাকেই অবলম্বন করিয়া সমস্ত শিক্ষাকার্য চলিতে থাকে। চরকা বা তাঁতশিল্প, কিংবা কৃষি বা কাঠের কাজ ইত্যাদির যে কোন একটিকে নির্বাচন করিয়া তাহারই সাহায্যে ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, জ্যামিতি প্রভৃতি শিক্ষা দিতে হইবে। এবং সেই সঙ্গেই শিক্ষার্থীর দেহ, মন, তাহার সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতিকেও ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষাদানের ব্যবস্থার সঙ্গে কোন একটি শিল্পকে জুড়িয়া দেওয়া, তিনঘণ্টা বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতি মত লেখাপড়া করিয়া তাহার সঙ্গে একঘণ্টা কোন একটি শিল্প শিক্ষা দেওয়া আর গান্ধীজী প্রবর্তিত শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে। শিল্পটি উৎপাদক শক্তি বিশিষ্ট হওয়া চাই এবং এমন হওয়া চাই যে তাহার মারফত বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মানুষের প্রধান প্রধান কর্ম ও চিন্তাধারার সঙ্গে ইহার স্বাভাবিক যোগ থাকা প্রয়োজন এবং বিদ্যালয়ে যতগুলি বিষয় পড়ান হয় সে সবগুলি বিষয় যেন ইহার মধ্যে প্রবেশ করান যাইতে পারে। একটি বৃত্তিকেই প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়া শিক্ষা চালনা করা হয় বলিয়া যেন মনে করা না হয় যে কতকগুলি কারিগর তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই ওয়ার্ধা শিক্ষাপদ্ধতি পরিকল্পিত হইয়াছে। দেশে কারিগরের অভাব

নাই, তাহাদেরই অন্ন জুটে না; আবার পরিকল্পনা করিয়া এক-দল কারিগর সৃষ্টি করিবার জন্যই যে দেশের বুদ্ধিমান হিতৈষীরা এই শিক্ষাব্যবস্থা কল্পনা করেন নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। যে দেশে অন্ন সমস্যায় অধিকাংশ লোক প্রপীড়িত, সে দেশের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অন্ন ব্যবস্থার সন্ধান মিলাইয়া দেওয়া বাস্তব প্রয়োজন। একটি সূত্রধরের নিকট ছুতারবিদ্যা শিখিয়া আমি যন্ত্রচালনা করিতে শিখি বটে কিন্তু আমার বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ লাভ ঘটে না বলিলেই চলে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে শিক্ষিত একটি ছুতারের নিকট যদি কাজ শিখি তবে আমার বুদ্ধিও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া যাইবে। তখন আমি কেবল একজন দক্ষ ছুতারই হইব না, ইঞ্জিনিয়ারও হইব। কেননা তখন যন্ত্র-চালনার সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে অঙ্ক শিখাইবে, বিভিন্নকাঠের পার্থক্য বুঝাইবে, কোন্ কাঠ কোথা হইতে আসিয়াছে ইত্যাদি জানাইবে। ইহাতে আমার কিছু ভূগোল ও কিছু কৃষিও শিক্ষা করা হইবে। ইহা ব্যতীত সে আমাকে যন্ত্রপাতি আঁকিতে শিক্ষা দিবে এবং সেই সঙ্গে কিছু জ্যামিতিও শিখিতে পারিব। এইভাবে ওয়ার্ধা-শিক্ষা-পরিকল্পনাতে হস্ত চালনার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির উৎকর্ষের ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিশুর শারীরিক ও সামাজিক আবেষ্টনকে শিল্পটির সঙ্গে যোগ করিয়া দিতে হইবে। যদি চরকা-কাটাকে কেন্দ্র করা যায় তবে বেশি সময়ই চরকা কাটিতে হইবে। বেশি সময় চরকা কাটিতে হইবে বটে কিন্তু উহা নেহাৎ যন্ত্রচালিতের মত করিয়া যাওয়া হইবে না—উহার সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্য বিষয় এমন কৌশলে

যুক্ত করিয়া দিতে হইবে যে বেশিক্ষণ ধরিয়া চরকা কাটিলেও তাহা বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়াইবে না। আমরা ওয়ার্ধা পরিকল্পনার প্রথমশ্রেণীর শিক্ষাসূচী এইখানে তুলিয়া দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব যে বিভিন্ন বিষয় কিভাবে চরকা কাটার মধ্য দিয়া অনুপ্রবিষ্ট করান হইয়াছে।

প্রথমশ্রেণী

অঙ্ক—নাটাইতে সূতা জড়াইবার সময় কতবার সূতা জড়ান হইল তাহা গুণিতে হইবে, কে একদিনে কত পাজা সূতা কাটিল, তাহা গুণিতে হইবে, এবং সূতা কাটিবার সমস্ত যন্ত্রপাতি গুণিতে হইবে।

আঙ্গুলে গণিয়া, তকলি, নাটাই ইত্যাদি এবং শিশুদেরও প্রতি লাইনে দশজন করিয়া সাজাইয়া এবং দশটি পাজা এক সাথে কাটিতে দিয়া দশমিকের জ্ঞান দিতে হইবে।

সূতাকাটার প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া যোগের নামতা প্রস্তুত করা যাইতে পারে কিংবা বিভিন্ন পদার্থ গুণিয়া ও বিভিন্ন বিভাগে সাজাইয়াও যোগের নামতা প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

কতগুলি পাজা কাটিতে দেওয়া হইয়াছিল এবং সূতাকাটার পর কতগুলি বাকি রহিল, তাহার হিসাবে বিয়োগের নামতা প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

মাপিবার সূতা এবং কাটিবার জন্য যে পাজা দেওয়া গেল তাহার পরিমাপ অঙ্কের কয়েকটি বিষয় শিক্ষা দিবে; যেমন মাপিবার ইউনিট, রেখা, বক্র এবং সরল। দ্রষ্টব্যঃ—১৬০ পর্যন্ত গণনা

করা ও লেখা সূতাকাটা ও নাটাইতে জড়ানর কাজে প্রয়োজন হয় ; কেননা ১৬০ পাকে এক লতি, ১৬ পাকে এক কলি এবং ৪ ফিটের এক পাকে এক এক তার হয়।

সামাজিক শিক্ষা—পুরাকালের মানুষের পরিধেয়ঃ গাছের পাতা, ছাল, চামড়া ব্যবহার করিয়া ক্রমে উল, তূলা ও সিল্কের ব্যবহার প্রচলন।

বিভিন্ন দেশের লোকদের পোশাক ঃ আরব, এস্কিমো, আফ্রিকার বামন। গরম ও শীতের দেশের লোকের পরিধেয়ের পার্থক্য ; পরিধেয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।

সাধারণ বিজ্ঞান—তূলাগাছের বিভিন্ন অংশের নাম ও তাহাদের কাজ ঃ ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের পোশাকের পরিবর্তন। শীত ও উত্তাপ হইতে বস্ত্র কিরূপে রক্ষা করে ? তূলা ধূনান ও সূতাকাটার উপর আর্দ্রতার প্রভাব। প্রাতঃকালে তূলা সংগ্রহ। তূলার বীচির অঙ্কুরোদ্গম ;

অঙ্কন—তূলা গাছ, তূলা ফুল ও তূলার বীজ-কোষ অঙ্কন।

মাতৃভাষা—শিল্পকর্মে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির নামকরণ, তূলা ধূনান ও তকলি দিয়া সূতাকাটার বিভিন্ন প্রণালী বর্ণন ; সূতাকাটার বিষয়ে পল্লীগীতি ও শস্য কাটার গান।

উপরে বর্ণিত প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যসূচী হইতে বর্তমান প্রচলিত পুঁথিগত বিদ্যার তিনঘণ্টার সাথে এক ঘণ্টায় কোন একটি শিল্প শিক্ষা জুড়িয়া দেওয়া এবং গান্ধীজী প্রবর্তিত শিল্প-কেন্দ্রিক শিক্ষার পার্থক্য কোথায় তাহা আশা করি স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

গান্ধীজীর এই পরিকল্পনার সঙ্গে ফ্রোবেল, মণ্টেসরী, নিও ফ্রোবেল প্রভৃতির পরিকল্পনার পার্থক্য কোথায় বুঝিতে হইবে। প্রজেক্ট মেথডের সঙ্গেই ইহার সাদৃশ্য সর্বাপেক্ষা বেশি। প্রজেক্ট মেথডের মত ইহা একটি প্রজেক্ট বা প্ল্যানকে কেন্দ্র করিয়া চলে, কিন্তু তথাপি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। প্রজেক্ট মেথডে যে শিল্প গ্রহণ করা হয় তাহা শিক্ষার্থীর পরবর্তী জীবনের জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নহে, জীবিকা অর্জনের সহায়কও নহে; প্রজেক্ট মেথডে "...the child is not educated through the project, but only around it." ওয়ার্ধা পরিকল্পনাতে শিল্পটি হয় উৎপাদক শক্তি বিশিষ্ট। ইহা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবিকার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সম্পর্কিত এবং কিভাবে এই শিল্পের মারফত সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। কিছুটা ওয়ার্ধা পরিকল্পনার মত একটি শিক্ষাপদ্ধতি জার্মান ও ডেনমার্কের গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত আছে। ট্রাপিষ্ট মোনাষ্টারীগুলিতে হাতের কাজ শিক্ষার উপরই জোর দেয় বেশি কিন্তু গান্ধীজী তাঁহার পরিকল্পনার মধ্য দিয়া একটি গোটা মানুষ সৃষ্টি করিতে প্রয়াসী।

হাতের কাজের প্রতি এই যে জোর দেওয়া হইয়াছে তাহার বিশেষ কারণ আছে। মানুষ কেবল মন দিয়া শেখে না, সমস্ত ইন্দ্রিয় অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদ ও স্পর্শ এই সব দিয়াই মানুষ শেখে—বর্তমান বিজ্ঞান ইহাই বলিয়া থাকে। তাই শুধু মনের উপর শিক্ষার ভার না দিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সমভাবে চালনা করিলে শিক্ষা সহজ, স্বাভাবিক ও

সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু আমরা শুধু পুঁথি পড়িয়া শিখি। ইহা স্বাভাবিক নহে। ইহা ব্যতীত আমাদের ভিতরকার সংস্কারই এই যে আমরা পুঁথিকে সম্মান করি, হাতের কাজকে অবজ্ঞার চোখে দেখি। বিদ্যা ও জ্ঞানকে কৌলিন্য দেই, কর্ম বা দেহ-শ্রমকে নিম্নস্তরের বলিয়া গণনা করি। কিন্তু জীবনের মধ্যে দেখি জ্ঞান বা বিদ্যার মত কর্ম বা দেহশ্রমের সমান প্রয়োজন। এই বিভেদ আমাদের জীবনে অশান্তি আনিয়া দিয়াছে। তাই আজ বিদ্যার ন্যায় কর্মেরও যে সমান মূল্য, সমান স্থান একথা স্পষ্টভাবে বলিবার দিন আসিয়াছে। তাই শৈশবকাল হইতেই কর্ম ও বুদ্ধিকে শিক্ষার দুইটি সমান অঙ্গ করিয়া উহাদের সমমূল্যে বুঝিতে হইবে।

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করিতে হইলে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তাহা যে আমাদের মোটেই নাই, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কোটি কোটি নিরন্নের শিক্ষার জন্য যদি টাকা না থাকে, তবে স্বাবলম্বী শিক্ষা পদ্ধতি সৃষ্টি করা প্রয়োজন একথা সর্বাগ্রে গান্ধীজীর মনে আসিয়াছিল। স্বাবলম্বী কথাটা এই শিক্ষা পদ্ধতিতে দুইটি বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ এই শিক্ষা শিশুদের পরবর্তী জীবনে স্বাবলম্বী করিবে, দ্বিতীয়তঃ ইহা নিজেই স্বাবলম্বী অর্থাৎ নিজের খরচ নিজে জোগায়।

বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির সহিত আমাদের বাস্তব জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া শিক্ষা অন্তে আমরা চোখে সরিষা ফুল দেখি। যাহা এতদিন ধরিয়া মুখস্থ করা গেল,

জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইয়া দেখি, তাহা কোনই কাজ দিতেছে না। দারিদ্র নিপীড়িত দেশে জীবিকা অর্জন যেখানে এত কষ্টকর—সেখানে বর্তমানের মত উদ্দেশ্যহীন কল্পনাবিলাসী শিক্ষাব্যবস্থা আমাদিগকে অন্ধকারের দিকেই শুধু লইয়া যায়। তাই গান্ধীজী আমাদের ছেলেদিগকে ভবিষ্যৎ বেকার অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন। আমাদের দেশে ৬।৭ বৎসর বয়সের শিশুদিগকে জীবিকা অর্জনের কাজে পিতামাতাকে কম বেশি সাহায্য করিতে হয়। ১৪ বৎসর বয়সে তাহাকে সংসারের অনেকখানি ভারই লইতে হয়। সেই অবস্থায় উদ্দেশ্যহীন শিক্ষা যে কী ক্ষতিকর তাহা আমাদের বর্তমান অবস্থার দিকে একটু দৃষ্টি দিলেই বুঝা যাইবে। তাই ওয়ার্ধা শিক্ষাব্যবস্থা "a kind of insurance againt unemployment."

স্বাবলম্বী কথাটার দ্বিতীয় অর্থ এই যে শিশুদের প্রস্তুত দ্রব্যাদির মূল্য হইতে শিক্ষকদের বেতন দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রথম দুই বৎসরে শিশুরা যাহা প্রস্তুত করিতে পারিবে তাহাতে শিক্ষকদের সমস্ত বেতনটুকু হয়তো উঠিবে না, কিন্তু পরবর্তী বৎসরগুলিতে এই দিক দিয়া স্বাবলম্বী হওয়া যাইবে। একটি শিশু যদি দৈনিক ৪ঘণ্টা কাজ করে তবে সপ্তাহে ২৫দিনে ঘণ্টায় দুই পয়সা করিয়া প্রতিমাসে সে ৩৵০ আনা বিদ্যালয়ের জন্য রোজগার করিতে পারে। অবশ্য প্রথমদিন হইতেই যে সে দুই পয়সা করিয়া রোজগার করিতে পারিবে তাহা নয় তবে সর্বশুদ্ধ সে এই হারে রোজগার করিবে ইহা বলা চলে।

বিদ্যালয়ের এই উপার্জন হইতে শুধু শিক্ষকদের বেতন দিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে; জমি, বাড়ী, আসবাবপত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা এই অর্থ হইতে হইবে না। ভারতবর্ষের সীমাহীন দারিদ্র ও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় টাকার একান্ত অভাব দেখিয়াই গান্ধীজী এইরূপ ব্যবস্থা করিতে প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। যেখানে কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন, সেখানে ইহা ছাড়া আর উপায় কি? ইহার আর একটি সার্থকতা এই যে ইহাতে শিক্ষার্থীরা নিজেরা কিছু সৃষ্টি ও আয় করিবার গৌরব লাভ করিতে পারিবে।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনার আর একটি মূল কথা এই যে ইহা অহিংসা ও সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আজ আমরা দেখি মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস। অপরকে বঞ্চিত করিয়া, পরাজিত করিয়া, পদদলিত করিয়া শুধু নিজের জন্য বাঁচিবার চেষ্টা। সমস্ত পৃথিবীটাতে এই ব্যাপার চলিতেছে। পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া প্রত্যেকে যেমন নিজের জন্য, তেমনি অপরের জন্যও বাঁচিবে এই মনোবৃত্তি লইয়া চলিবে—ইহাই "মানুষের" জীবনের কথা। মানুষের সমাজকে সেইভাবে গড়িতে হইলে শৈশব হইতেই তাহাকে সেইভাবে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এই ব্যবস্থার মধ্যে সেই ত্যাগ, অহিংসা, সহযোগিতা প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া শিশুর মধ্যে গঠন-মূলক মনোবৃত্তি উন্মেষের চেষ্টা রহিয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দেশের প্রতিটি মানুষ ও প্রতিটি গৃহপালিত জীবকে কর্মে নিযুক্ত করিয়া তাহার আহারের ব্যবস্থা করা যায়, ততক্ষণ

পর্যন্ত মিল বা মেসিনে প্রস্তুত দ্রব্যাদি ক্রয় করা আমাদের পক্ষে পাপ ও হিংসার কার্য। তাই গান্ধীজীর মতে আমাদের পক্ষে এইরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। আমরা যদি আমাদের প্রতি শোষণ ও বঞ্চনা নিবারণ করিতে চাই, আমরা যদি সাম্প্রদায়িক কলহ নিবারণ করিতে চাই, তবে আমাদের মধ্যে এই সহযোগিতার ভাব, এই গঠনমূলক ভাব শিশুকাল হইতেই উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

এই শিক্ষা পরিকল্পনার আর একটি মূল কথা হইতেছে এই যে ইহা বাস্তব জীবনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার সহিত গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত। বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মস্ত ত্রুটি এই যে ইহার বিভিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে যেমন সমন্বয় নাই তেমনি আমাদের পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে ইহার সহজ ও সুনিপুণ সামঞ্জস্যের একেবারেই অভাব। এইজন্য মানুষের তিনটি দিককে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাসূচী প্রস্তুত করা গিয়াছে। বাহ্যিক অথবা শারীরিক আবেষ্টনী, সামাজিক আবেষ্টনী ও শিল্পকাজ। এখানে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা বাস্তব কার্যাবলী বা অবস্থার মধ্য দিয়া বলিতে হইবে এবং সেই ঘটনা বা অবস্থাগুলি নি শল্প কিংবা সামাজিক বা দৈহিক আবেষ্টনী হইতে লইতে হইবে। যাহাতে শিশু যাহা কিছু শিক্ষা করে, তাহা যেন তাহার ক্রম বর্ধমান জীবন ধারার সঙ্গে সুন্দরভাবে খাপ খাইয়া যায়। পূর্বব্যবস্থা যেমন নিশ্চল ও জীবনের সহিত সম্পর্কশূন্য ছিল, এই ব্যবস্থা তেমনই কর্ম, পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ ও গবেষণায় পরিপূর্ণ হইয়া জীবনের

কাকলিতে মুখরিত হইয়া উঠিবে। আজ আমরা কেবল কতকগুলি বুলি মুখস্থ করি, যাহার সঙ্গে শিশুর জীবনের অভিজ্ঞতার কোনখানে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ওয়ার্ধা-পরিকল্পনাতে সামাজিক শিক্ষা ও সাধারণ বিজ্ঞান জীবনের ঘটনা ও অবস্থার সহিত কিভাবে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা দেখিয়াছি। এই বিষয়গুলি যে কেবল সুন্দরভাবে মিলাইয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা নয়, এগুলি শিশুর সামাজিক আবেষ্টনী হইতে শিশুর বাড়ী, তাহার গ্রাম, সমস্ত কাজকর্ম, তাহার বৃত্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহাতে সামাজিক অবস্থার সহিত তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয় এবং এই পরিচয়ের জন্যই অল্প অল্প করিয়া তাহার মধ্যে সামাজিক দায়িত্বজ্ঞান জন্মে।

নাগরিকতার আদর্শ—ওয়ার্ধা পরিকল্পনার আর একটি মূল কথা হইতেছে এই যে এই পরিকল্পনার মধ্যে আদর্শ নাগরিক হওয়ার খোঁজ রহিয়াছে। বর্তমান শিক্ষব্যবস্থায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে আদর্শ নাগরিক হওয়ার কোন প্রচেষ্টাই নাই—এ দিকটাকে একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় প্রজাতন্ত্রশাসনানুরাগী নাগরিকতাই কাম্য। আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে শিশুকাল হইতেই সচেতন করা বিশেষ বাঞ্ছনীয়। আমার দেশ, আমার জাতি সমস্ত পৃথিবীর কাছে কি অবস্থায় আছে তাহা শিশুকাল হইতেই জানিতে হইবে। এই ওয়ার্ধা পরিকল্পনার মধ্যে সেইরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে।

শিশুদের মন যখন কাঁচা, তখন সেই কাঁচা মনেই তাহাদের মধ্যে নূতন কথা প্রবেশ করাইতে না পারিলে আর কোনদিনই তাহারা সে সকল গ্রহণ করিতে পারিবে না। পাঠ্যজীবন হইতেই তাহাদের জানান ও বুঝান দরকার যে তাহারা জাতীয় জীবনের অংশবিশেষ।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনার গৌণ কথা এইগুলি—(১) সাত-বৎসরের আবশ্যিক শিক্ষা; (২) ভারতীয় ভাষার প্রতি সমধিক দৃষ্টি; (৩) প্রবেশিকা ষ্ট্যাণ্ডার্ড; (৪) দ্রব্যাদি বিক্রয়।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনাতে সাত বৎসরের অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদিন পর্যন্ত ৫ হইতে ১০ বৎসর পর্যন্ত ৫ বৎসরের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় তাহাকে ৭ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত ৭ বৎসরের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আজ প্রাথমিক শিক্ষার পূর্বের সময়ের জন্য কোন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত নাই; কিন্তু ওয়ার্ধা পরিকল্পনাতে আবশ্যিক অবৈতনিক শিক্ষার পূর্বে গৃহ-শিক্ষার একটা ব্যবস্থা আছে। আজিকার পাঁচবৎসরের শিক্ষায় কেবল প্রাথমিক শিক্ষাটুকু দেওয়া হয়, কিন্তু ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় রকম শিক্ষার ব্যবস্থাই রহিয়াছে। অত অল্প বয়সে এবং অত অল্প সময়ে অক্ষর পরিচয় করান যায় বটে কিন্তু প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই শেখান সম্ভব হয় না। কিন্তু যে সকল শিশুদের জীবনে ঐ কয়টি বৎসরই শিক্ষার সময়, ইহার পরই যাহাদের জীবিকা অর্জনের জন্য জীবন সংগ্রামে প্রবেশ করিতে হইবে, তাহাদের কয়েকটি বিষয় জানাইয়া

দিবার প্রয়োজন আছে। একটি শিশুকে পরবর্তী জীবনের অবশ্যপ্রয়োজনীয় সামাজিক ও নাগরিক ট্রেণিং দিতে চাহিলে ১৪ বৎসরের আগে এবং পূর্ণ ৭ বৎসরের শিক্ষার কমে সম্ভব হয় না। এই যে ৭ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার কাল ধরা হইয়াছে তাহার আর একটি প্রধান কারণ এই যে ঠিক বয়ঃ-সন্ধিকালটা শিশুর পক্ষে কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। ১৪ বৎসর পর্যন্ত তাহার দেহ-মনের সন্ধিক্ষণটা কাটাইয়া দিতে পারিলে সে একটা দৃঢ় ভিত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনাতে ভারতীয় ভাষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশবাসী নিজের মাতৃভাষাতে শিক্ষালাভ করিবে। রাষ্ট্রভাষা হিসাবে হিন্দুস্থানী অবশ্যশিক্ষনীয় বিষয়রূপে নির্ধারিত হইয়াছে। হিন্দুস্থানীতে কথা বলিতে, ছোটখাট বক্তৃতা দিতে, কর্মব্যপদেশে প্রয়োজনীয় পত্রাদি লিখিতে, সহজ বই এবং দৈনিক ও মাসিক পত্রাদি পড়িতে সক্ষম হইতে হইবে।

এই পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য ইংরাজীর ব্যবস্থা নাই। গান্ধীজীর মতে মাতৃভাষার সাহায্যে হাতে কলমে ৭ বৎসরে একমাত্র ইংরেজী ব্যতীত অপর সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর যে জ্ঞান হইবে, তাহা বর্তমানের প্রবেশিকার মানের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে।

শিশুদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি সরকার কিনিয়া লইবেন। সেগুলি খুব সুন্দর ও টেকসই হইবে না ইহা স্বাভাবিক এবং মিলে

প্রস্তুত দ্রব্যাদির সঙ্গে তাহার তুলনা করিতে যাওয়া বাতুলতা। তথাপি যদি কেহ প্রশ্ন করে বালকদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি লোকে কিনিবে কেন তবে তাহাদের এই কথাটাই বলা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের ডাণ্ডীর মিলগুলি যে লিনেন বস্ত্র প্রস্তুত করিত তাহা যেমন মোটা ছিল আবার তাহার দামও ছিল বেশি ; তথাপি রাণী এলিজাবেথ ঐ ডাণ্ডী লিনেনেই মৃত-দেহের কবর দিতে হইবে বলিয়া আদেশ দেন এবং তাঁহার সেই আদেশ সে দেশের লোক পালন করিয়াছিল। তবে আমাদের দেশের লোক দেশের শিশুরা শিক্ষার মধ্য দিয়া যাহা প্রস্তুত করিবে, তাহা কিনিবে না কেন? অবৈতনিক বলিতে আজকাল বুঝায় যে যাহার জন্য অভিভাবককে শিশুর শিক্ষার পরিবর্তে কোন টাকা পয়সা বিদ্যালয়ের বেতন স্বরূপ দিতে হয় না। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় অভিভাবককে কোনরূপ বেতন দিতে হয় না বটে কিন্তু শিক্ষার্থীকে পরোক্ষভাবে কিছু দিতে হয়। অর্থাৎ সে যাহা প্রস্তুত করে তাহার মূল্যটা শিক্ষকের বেতন হিসাবে বিদ্যালয়ের পুঁজিতে যায়।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনাকে আমরা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অচল অবস্থার সমাধান করিতে হইলে ওয়ার্ধা পরিকল্পনার মত আমূল পরিবর্তন দরকার। এরূপ না হইলে প্রকৃত কাজ হইবে না। ১৯৩৭ খ্রীঃএ কংগ্রেস যখন কয়েকটি প্রদেশে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, কাশ্মীর এই কয়টি প্রদেশে এই পরিকল্পানুযায়ী কাজ আরম্ভ হইয়াছিল।

এই কয়টি ব্যতীত কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া উঠিয়াছিল। (১) দিল্লীর জমিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, (২) অন্ধ্র জাতীয় কলাশালা ও (৩) গুজরাটের সুরাট জিলায় (vedchchi) বেদছি আশ্রম। ইহা ছাড়া আরও কয়েকটি কেন্দ্র ছিল। মহীশূর ষ্টেটে তাগাদর নামক স্থানে একটি, পুণার নিকটবর্তী স্থানে চারটি গ্রাম জুড়িয়া তিলক মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ কর্তৃক পরিচালিত একটি, মধ্যপ্রদেশের হোসাঙ্গবাদ জিলায় একটি—এইরূপ আরও কয়েকটি ওয়ার্ধা পরিকল্পনানুযায়ী শিক্ষকদের ট্রেণিং কেন্দ্র কিংবা শিশুদের বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কংগ্রেস দীর্ঘদিন মন্ত্রীত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন না, তথাপি ঐ অল্প সময়ে তাঁহারা যতটা কাজ করিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত দেশের পক্ষে খুবই আশাপ্রদ হইয়াছিল। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে কংগ্রেস দীর্ঘদিন মন্ত্রীত্বে থাকিতে পারেন নাই এবং কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করার পরে পরবর্তী মন্ত্রীগণ ওয়ার্ধা পরিকল্পনার মত একটি ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

বাঙ্গালাদেশে ১৯৪৪ খ্রীঃ এর ৭ই জুন মেদিনীপুর জিলার ঝাড়গ্রামে এই পরিকল্পনানুযায়ী একটি ট্রেণিং কেন্দ্র খোলা হয়। ৫জন মহিলা ও ১৮জন পুরুষ শিক্ষককে লইয়া কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহারা বর্তমানে ঐ ট্রেণিং শেষ করিয়া বিভিন্ন জিলায় বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। মেদিনীপুর জিলায় ৬টি, ঢাকার তাজপুরে ১টি, বর্ধমানে ১টি এবং ফরিদপুরের রাজবাড়ীতে ১টি।

কেন্দ্রীয় এড্‌ভাইসরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক যুদ্ধোত্তর ভারতের জন্য শিক্ষা-পরিকল্পনা

(সার্জেন্ট স্কীম নামে প্রচলিত)

অনেকদিন আগেই হোয়াইট পেপার বলিয়াছিল যে এদেশের ভাগ্য শিক্ষার উপর নির্ভর করে। কিন্তু ইংলণ্ডে যুদ্ধের পূর্বে শিক্ষার জন্য জনপ্রতি ৩৩৶০ খরচ করা হইত আর ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দেও ভারতবর্ষে শিক্ষার জন্য খরচ করা হইত ॥১৫ পয়সা। অতএব দেশের ভাগ্যে কোনপ্রকার শিক্ষা লাভ ঘটে নাই। যাহাহউক, অন্যান্যদেশের আদর্শে ভারতবর্ষে কম করিয়াও কতটুকু শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় ১৯৩৫ খ্রীঃ হইতেই কেন্দ্রীয় এড্‌ভাইসরি বোর্ড সেজন্য কয়েকটি কমিটি গঠন করিয়াছিল। (১) (Basic) বুনিয়াদি শিক্ষা, (২) বয়স্কদের শিক্ষা, (৩) বিদ্যালয়ের শিশুদের স্বাস্থ্যোন্নতি, (৪) বিদ্যালয় গৃহ, (৫) সমাজ সেবা, (৬) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় সমূহের জন্য শিক্ষক নিয়োগ, তাহাদের ট্রেণিং এবং চাকুরীর নিয়মাবলী, (৭) শিক্ষাবিভাগে কর্মচারী নিয়োগ, (৮) ব্যবসা ও শিল্পসংক্রান্ত শিক্ষা সমেত টেকনিক্যাল শিক্ষা। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়া আসিতেছিল। এড্‌ভাইসরি বোর্ড যুদ্ধোত্তর প্রয়োজন ও যুদ্ধোত্তর

বিভিন্ন উন্নয়ন সম্পর্কে কমিটির মতামত মানিয়া লইয়া যুদ্ধোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থার একটা বিস্তৃত খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন। আমরা এখানে শুধু প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত বিবৃত করিব।

এই পরিকল্পনার জন্য বহুকোটি অর্থের প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে কমিটি এই কথাই বলিয়াছেন যে কোন বিষয়ের জন্য মানুষের প্রয়োজনবোধ যখন তীব্র হইয়া উঠে, তখন তাহা লাভের পথও হইয়া যায়; অন্ততঃ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়।

এই পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করিবার সময় বোর্ড যুদ্ধের পূর্বে ব্রিটেন ও অন্যান্য পাশ্চত্য দেশগুলিতে যেরূপ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, শিক্ষার সেইরূপ একটি মানদণ্ড আমাদের দেশেও রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল পাশ্চাত্য আদর্শ বা পাশ্চাত্য পদ্ধতি আমাদের পক্ষে বিশেষভাবে খাপ খাইতে পারে তাঁহারা সেইগুলিই গ্রহণ করিবার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তাঁহারা আরও মনে করেন যে ভারতবর্ষের এক অংশ অপর অংশ হইতে অনেকাংশেই পৃথক বলিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি অপরিবর্তনীয় কিংবা বিস্তৃত পরিকল্পনা না করিয়া বোর্ডের সাধারণভাবে নিজের বক্তব্য বলিয়া যাওয়া উচিত। সমস্ত পরিকল্পনাটি যাহাতে মূলতঃ ভারতীয় হয় সে বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ নজর রাখিয়াছেন। অবশ্য সেই সঙ্গে ইহাও তাঁহারা স্বীকার করেন যে এমন কতকগুলি মূল নীতি আছে যাহা যে কোন দেশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ বংশধরের পক্ষে আয়ত্ত করা বিশেষ প্রয়োজন। শারীরিক স্বাস্থ্য, বুদ্ধি ও চরিত্রের বল পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ না পাইলে কোন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমাজই উন্নতির চরম শিখরে উঠিতে পারে না।

এইস্থানে একটি সাবধান বাণী উচ্চারণ করা দরকার। অনেকে মনে করিতে পারেন যে বুনিয়াদি শিক্ষার জুনিয়ার স্টেজ প্রথমে প্রবর্তন করিয়া তাহার পর অবস্থা ও অর্থ বুঝিয়া সিনিয়ার স্টেজ প্রবর্তন করা যাইবে। কিন্তু ইহা একেবারেই সমীচিন নয়। অন্যান্য দেশে এই পন্থা অবলম্বন করাতে যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে। ৬ হইতে ১৪ বৎসরের এই বুনিয়াদি শিক্ষা একটি সমগ্র ও জীবন্ত বস্তু (organic whole) এবং উহাকে সমগ্র ও জীবন্ত হিসাবে বিবেচনা না করিলে তাহার অনেকখানি মূল্যই নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত সমস্ত জীবনের জন্য মোটে পাঁচ বৎসর শিক্ষা দেওয়া এবং মাত্র ১১বৎসরে শিক্ষা শেষ করায় কোন প্রকৃত শিক্ষাও হয় না. আর জীবিকা অর্জনের পক্ষেও তাহা কোন সাহায্য করে না। যদি সবস্থানে একসঙ্গে জুনিয়ার ও সিনিয়ার স্টেজ প্রবর্তন করা সম্ভব না হয় তবে অল্প কয়েক স্থানেও সবটা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। কিন্তু শুধু জুনিয়ার স্টেজ প্রবর্তন করিয়া পরে সুবিধামত সিনিয়ার স্টেজ প্রবর্তন করিবার সিদ্ধান্ত কোনক্রমেও যুক্তিযুক্ত হইবে না।

এই পরিকল্পনায় মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে পৃথক করিয়া কিছু বিবৃত করা হয় নাই। পূর্বে যদিও মেয়েদের শিক্ষাকে

স্বতন্ত্র করিয়া ধরা হইত কিন্তু আজ বলা চলে যে আবশ্যকীয় পরিবর্তন করিয়া শিক্ষার সমস্ত সুবিধা ছেলেমেয়ে উভয়কেই দিতে হইবে। এই পরিকল্পনার সকল ব্যবস্থাই ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য সমভাবেই প্রযোজ্য বলিয়াই মেয়েদের কথা ভিন্নভাবে লেখা হয় নাই।

অনেকটা এইরূপ কারণেই সম্প্রদায় বা জাতিগত কোন বিভেদের প্রশ্ন এই শিক্ষাক্ষেত্রে তোলা হয় নাই। বোর্ড মনে করেন যে একটি জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি—যদি তাহা সত্য সত্যই জাতীয় পদ্ধতি হয়, তবে তাহা সম্প্রদায় ও জাতি-নির্বিশেষে সকলের প্রয়োজনই মিটাইতে সক্ষম।

বুনিয়াদি (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) শিক্ষা

একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অপর সকল সভ্য-দেশেই ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্যই একটি জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা স্বীকৃত হইয়াছে। এই শিক্ষা প্রত্যেক অধিবাসীর নাগরিকত্ব লাভ করার পথে ন্যূনতম উপাদানমাত্র।

ভারতবর্ষেও কয়েক বৎসর যাবতই এ প্রচেষ্টা হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু সত্যিকার কাজ যে কিছুই হয় নাই তাহার মস্তবড় প্রমাণ এই যে আজও দেশে শতকরা ৮৫ভাগের বেশি লোক অশিক্ষিত। জগতের বর্তমান আবেষ্টনে কোন দেশের পক্ষে এইরূপ অবস্থা বিপজ্জনক ; বিশেষতঃ যে দেশ গণতন্ত্র লাভ করিতে চায় তাহার পক্ষে ইহা মারাত্মক।

বোর্ড ৬ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত কাল প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাধ্যতামূলক করিয়াছে। তবে ছেলেমেয়েদের পাঁচ কিংবা আরও অল্প বয়স হইতে বিদ্যালয়ে যাইতে উৎসাহিত করা উচিত। সমস্ত পৃথিবীর মতে মত মিলাইয়া বোর্ড বলে যে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা অবৈতনিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অন্যত্র যাহা আছে তাহার তুলনায় ভারতবর্ষের জন্য এখানে যে ব্যবস্থা করা হইল তাহা স্বল্প মনে হইতে পারে, কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষে যাহা আছে তাহার তুলনায় ইহা অনেকখানি এবং দেশের অনেক সমস্যাই ইহা নিবারণ করিবে। সমগ্র দেশে বিশেষতঃ পাঞ্জাবে কয়েকটি বাধ্যতামূলক শিক্ষা-কেন্দ্র ছিল কিন্তু কোনস্থানেই এই বাধ্যতামূলক অবস্থা বিশেষ কার্যাকরী হয় নাই। যেখানে ছেলেরা বিদ্যালয়ে যায় কিনা এবং না গেলে আইনতঃ তাহাদিগকে বাধ্য করা হয় কিনা দেখিবার জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত Attendance Officer এর ব্যবস্থা নাই, সেখানে কাজ যে বিশেষ হইবে না তাহা জানা কথাই। নামে মাত্র দুই চারিটি বাধ্যতামূলক কেন্দ্র ছাড়া সর্বত্রই শিক্ষা ছাত্র ও অভিভাবকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ইহার ফলে শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হিসাবে দেখা যায় প্রতি চারজন শিশুর একজনেরও কম চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছায় এবং এই চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত না পৌঁছিলে নিরক্ষরতা ঘুচিতে পারে না। অতএব যে খরচটা হয় তাহার ৮০ ভাগের উপর বিফলে যায়।

এই অপচয় নিবারণ করিবার একটিমাত্র উপায় হইতেছে

শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা। Attendance Officer এবং কোর্ট ছাড়াও সেজন্য শিক্ষা সম্বন্ধে বহুল প্রচার বিশেষভাবে করণীয়। অভিভাবকদের বুঝাইতে হইবে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত শিক্ষাটা তাহাদের সন্তানদের পক্ষে কত প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক দেশেই শিক্ষা প্রথম বাধ্যতামূলক করিবার সময় প্রতিরোধ আসে। এবং উপকার যাহাদের হইবে, বিরোধীতাও করে তাহারাই। যে সন্তানদের সাহায্য দৈনন্দিন কাজে অভিভাবক-দের দরকার হয়, কাজ বাদ দিয়া তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে অভিভাবকেরা সহজে রাজী হইবে না, ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। কিন্তু যে দেশে ক্ষুদ্র শিশুদের আয়ের উপর পরিবারের ভরণপোষণ নির্ভর করে সেদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বড় রকমের ত্রুটিই আছে সন্দেহ নাই। যাহাহউক, দেখা গিয়াছে যে পৃথিবীর সকল দেশের লোকই জনশিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থাকে প্রথমে বিরোধীতা করে বটে কিন্তু পরে ত্রুটিপূর্ণ হইলেও উহা পরিত্যাগ করিবার মনোবৃত্তি তাহাদের পরিবর্তিত হইয়া যায়।

কেন্দ্রীয় এড্‌ভাইসরি বোর্ড কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় ব্যতীত ওয়ার্ধা শিক্ষাপরিকল্পনার বাকি সবটাই সমর্থন করেন। কোনও কর্মের মধ্য দিয়া শিক্ষার নীতি সমস্ত পৃথিবীর শিক্ষাবিদগণই স্বীকার করেন। নিম্নশ্রেণীতে এই কর্মের নানা রূপ থাকে, পরে স্থানীয় অবস্থানুযায়ী কোন একটি বা একটির বেশি শিল্পকে অবলম্বন করা হয়। যতদূর পারা যায় এই সাধারণ নিয়মকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত পাঠ

নিয়ন্ত্রিত হইবে। কেবল "3 R"এর শিক্ষা অর্থাৎ লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক করিতে সক্ষম হওয়াকেই যোগ্য নাগরিক হওয়ার মাপকাঠি বলিয়া আজ আর স্বীকার করা যায় না সত্য। কিন্তু শিক্ষা কোন স্তরে বিশেষতঃ নিম্নস্তরে শিশুদের প্রস্তুত দ্রব্যাদির বিক্রয় লব্ধ অর্থদ্বারা স্বাবলম্বী হইবে, ওয়ার্ধা পরিকল্পনার এই মতবাদ বোর্ড স্বীকার করিতে পারে নাই। এইদিকে এই পর্যন্ত স্বীকার করা যাইতে পারে যে হাতেকলমে কাজের জন্য অতিরিক্ত উপকরণ ও সামগ্রীর খরচ এই অর্থদ্বারা সংকুলান করা হইবে।

বুনিয়াদি প্রাথমিক শিক্ষাকে দুইভাগে ভাগ করিতে হইবে। ভাগ করিবার সময় ইহার মূল ঐক্যটি যাহাতে বজায় থাকে, দুইস্তরের মধ্যে যাহাতে কোন ছেদ না পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রথম জুনিয়ার অথবা প্রাথমিক স্তর, দ্বিতীয় সিনিয়ার অথবা মাধ্যমিক স্তর। এই দুই স্তর একই শিক্ষা-ধারার দুই বিভাগ মাত্র, তাহা মনে রাখিতে হইবে। প্রাথমিক স্তর পাঁচ বৎসরের জন্য ও মাধ্যমিক স্তর তিন বৎসরের জন্য। কেহ কেহ ইহার বুনিয়াদি (Basic) নামকরণ পছন্দ করেন না এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বলিয়াই অভিহিত করেন। তাঁহারা যদি এই দুইটি স্তরের স্বাভাবিক ঐক্য এবং এই দুইটি মিলাইয়াই যে একটি প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা—এই সত্য ভুলিয়া না যান, তবে তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই। এই দুই বিভাগ করিবার প্রধান কারণ এই যে ১১।১২ বৎসরে ছেলেমেয়েদের দৈহিক ও মানসিক এমন কতকগুলি পরিবর্তন হয় যাহার জন্য

পাঠ্যসূচী ও পাঠদান পদ্ধতির মধ্যে একটু পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। এইজন্যই দেহে মনে একটি মনস্তত্ত্বগত পরিবর্তনের পরে দুইটি বিভাগের মূল উদ্দেশ্য এক হইলেও উহাদের কৌশল ও পথ চলিবার ধারা বিভিন্ন হইবে।

বুনিয়াদি শিক্ষার জুনিয়ার স্টেজে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া একেবারেই উচিত নয় বলিয়া বোর্ড মনে করেন। সিনিয়ার স্টেজেও ইংরাজী প্রবেশ করাইতে তাঁহাদের বিশেষ ইচ্ছা নাই। তবে কোন কোন স্থানে ইংরাজী শিখিবার জন্য জনমত প্রবল হইতে পারে। সেইজন্য বোর্ডের মতে প্রত্যেক প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের উপরই ইহার শেষকথা নির্ভর করিবে।

হাতে কলমে শিক্ষা দিবার খরচ যাহাতে সংকুলান হয় এবং উপযুক্ত ক্রমে ছাত্রদলকে বিভাগ করা যায় তাহার জন্য সিনিয়ার বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে উপযুক্ত সংখ্যক শিশু থাকা বিশেষ প্রয়োজন। এই কারণে ঘন বসতিহীন গ্রামের মধ্যে সিনিয়ার বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাত্রনিবাস খোলা প্রয়োজন।

শিক্ষকের উপরেই শিক্ষাপরিকল্পনার সকল সফলতা নির্ভর করে। এদেশে শিক্ষকেরা অত্যন্ত অল্প বেতন পাইয়া থাকে। সরকারী বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষকেরা প্রতিমাসে গড়ে ২৭৲ টাকা পায় এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ের বেতন ইহা অপেক্ষাও কম; কোন একটি প্রদেশে তাহারা গড়ে ১০৲ টাকারও কম পায়। শিক্ষা বিভাগে উপযুক্ত লোক পাইতে হইলে ইহার বেতন ও মর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে যে বাড়াইতে হইবে, ইহা খুবই স্পষ্ট। যদি ইহাকে বাস্তবিক সফল করিতে হয় তবে

শিক্ষাদানের মাপকাঠির একটি সর্বতোমুখী উন্নতি প্রয়োজন। কেননা শিল্পশিক্ষার সাথে সাথে অন্যান্য বিষয় যোগ করিয়া দেওয়ার জন্য এই বুনিয়াদি শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষাদান বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা থাকা প্রয়োজন।

একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা হইতেছে শিক্ষাদান কার্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রীর দরকার। জুনিয়ার বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে ২/৫ অংশ এবং সিনিয়ার বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে অন্ততঃ ১/৩ অংশ শিক্ষায়িত্রী নিযুক্ত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে উভয়েই থাকিবে। কিন্তু প্রাথমিক বুনিয়াদি (জুনিয়ার এবং সিনিয়ার) বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়ের জন্য পৃথক বিদ্যালয় থাকিবে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় শিক্ষার এড্ভাইসরি বোর্ড রিপোর্ট দিয়াছিল যে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে (জুনিয়ার এবং সিনিয়ার) শিক্ষক হইতে হইলে প্রবেশিকা কিংবা তাহার সমান কিছু পাশ থাকিতে হইবে। এবং দুই কিংবা তিন বৎসরের শিক্ষকতার ট্রেণিং লইতে হইবে। তাহাদের বেতন নিম্নলিখিতরূপে ধার্য করা হইয়াছে।

Infant ও নার্সারী বিদ্যালয় এবং জুনিয়ার বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিম্নতম বেতন প্রতিমাসে ৩০—১—৩৫ —২—৫০। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর বেতন একই রূপ। কমিটির মত এই যে গ্রামের শিক্ষকদের বিনা-ভাড়ায় বাড়ী দেওয়া উচিত; যেখানে তাহা সম্ভব নয় সেখানে বেতনের সঙ্গে আর ১০% যোগ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু যে সকল স্থানে জীবিকা নানাকারণে আরও ব্যয়সাধ্য সেখানে ইহা ৫০% পর্যন্ত

বাড়াইয়া দিতে হইবে; যেমন দিল্লী কিংবা প্রাদেশিক রাজধানীতে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রাথমিক বেতন ৪৫৲ হইতে উচ্চতম ৭৫৲ পর্যন্ত করা যাইতে পারে।

সিনিয়ার বিদ্যালয়ে বেতনের হার প্রতিমাসে ৪০—২ ৮০। অন্যান্য ব্যবস্থা জুনিয়ার বিদ্যালয়ের মতই। বোর্ড মেয়ে ও পুরুষের বেতন ভিন্ন কবিবার কোন কারণ দেখিতে পায় নাই।

উপরের বেতনের হার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সাধারণ সহকারী শিক্ষকদের জন্য। অন্যান্য চাকুরীর তুলনায় এই বেতন যোগ্য লোকের পক্ষে লোভনীয় কিছু নয়। কিন্তু যদি বেশি বেতন দিয়া কয়েকটি পদ সৃষ্টি করা যায়, তবে কিছু ভাল লোক পাওয়া যাইবে। জনসাধারণের কাছে বিশেষতঃ অভিভাবকদের কাছে শিক্ষকতাবৃত্তিকে সম্মানজনক করিয়া তুলিতে হইবে। একেবারে ক্ষুদ্রতম বিদ্যালয়টিরও প্রধান শিক্ষককে জিলার মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হওয়া চাই, এবং তাঁহার বেতন সেই পরিমাণে উল্লেখযোগ্য হওয়া দরকার।

বোর্ডের অভিমত এই যে সমস্ত শিক্ষকগণ কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বৃত্তিভোগী হইবেন এবং যেখানে বৃত্তিভোগের ব্যবস্থা নাই কিংবা অদূর ভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে আধাআধি ভিত্তিতে প্রভিডেন্ট ফণ্ড এখনই খোলা উচিত।

যদি জুনিয়ার বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে প্রতি ৩০ জনের জন্য একজন শিক্ষক এবং সিনিয়ার বিদ্যালয়ের প্রতি ২৫

জনের জন্য একজন শিক্ষক ধরি তবে ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্কদের ৫,১৫,২৫,০০০ সংখ্যার জন্য ১৮,২১,৭৬০ জন শিক্ষক দরকার হইবে। ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্কদের মধ্যে অন্তত: ২০% উচ্চবিদ্যালয়ে যাইবে আশা করা যায়, তাই সেই ২০% উপরের হিসাবে ধরা হয় নাই।

জুনিয়ার বিদ্যালয়ে সর্বসমেত বাৎসরিক খরচ ১১৪,২৯ লক্ষ, সিনিয়ার বিদ্যালয়ে ৮৬,৫০ লক্ষ। জুনিয়ার বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর প্রতি বালকের পিছনে ৩১.৮৪ টাকা এবং সিনিয়ার বিদ্যালয়ে ৫৫.৩১ টাকা খরচ হইবে। মোট খরচের ৭০% শিক্ষকদের বেতনে যাইবে। জুনিয়ার ও সিনিয়ার মিলাইয়া প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মোট খরচ হইবে ২০০ কোটি টাকা। সমস্ত পরিকল্পনাটি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে অন্তত: ৩৫।৪০ বৎসর সময় লাগিবে।

বুনিয়াদি শিক্ষার উপর বোর্ডের যে দুইটি কমিটি ওয়ার্ধা-পরিকল্পনাটি বিচার করিয়া দেখিয়াছিল তাহাদের রিপোর্ট এইরূপ। প্রথম কমিটি :—

(১) বুনিয়াদি শিক্ষাপরিকল্পনা প্রথমে পল্লী অঞ্চলে প্রবর্তন করিতে হইবে।

(২) ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স বাধ্যতামূলক শিক্ষার সীমা নির্দেশ করা গেল, কিন্তু পাঁচ বৎসরেও বিদ্যালয়ে ভর্তি-করান যাইবে।

(৩) ছাত্রেরা ১১ বৎসর বয়সে কিংবা ৫ম শ্রেণীর পরে বুনিয়াদি বিদ্যালয় হইতে অপর বিদ্যালয়ে যাইতে পারিবে।

(৪) প্রতি ছাত্রকে তাহার মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে।

(৫) সমস্ত ভারতের জন্য একটি সাধারণ ভাষা থাকা দরকার। হিন্দি ও উর্দু উভয় হরফে হিন্দুস্থানীই সেই সাধারণ ভাষা। ছাত্রেরা নিজেদের পছন্দমত হরফ নির্বাচন করিতে পারিবে। প্রতি শিক্ষককে উভয় হরফই জানিতে হইবে। বোর্ডের কোন কোন সভ্য বলেন যে এই ভাষার অসুবিধা এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের পরিশ্রম কমাইতে রোমান হরফ ব্যবহার করা ভাল।

(৬) হাতে কলমে শিক্ষা করার নীতি ওয়ার্ধাপরিকল্পনা Wood Abbot রিপোর্টের সহিত একমত। নিম্নশ্রেণীতে এই কর্মের নানা রূপ থাকিবে। উচ্চ শ্রেণীতে তাহা যে কোন একটি শিল্পকে অবলম্বন করিবে। ছাত্রদের প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিদ্যালয়ের খরচের মধ্যে যাইবে।

(৭) যে সকল সংস্কৃতিমূলক বিষয় শিল্পটির সাথে যোগ করা যায় না, সেগুলি ভিন্নভাবে শিক্ষা দিতে হইবে।

(৮) শিক্ষকদিগকে ট্রেণিং দিতে হইবে এবং তাহাদের মর্যাদা বাড়াইতে হইবে।

(৯) প্রতিমাসে ২০৲টাকার কমে কোন শিক্ষকের বেতন হইতে পারিবে না।

(১০) শিক্ষয়িত্রী জোগার করিতে হইবে এবং সুশিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েদের শিক্ষকতা বৃত্তিতে উৎসাহিত করিতে হইবে।

(১১) যখন উপযুক্ত ট্রেণিংপ্রাপ্ত শিক্ষক পাওয়া যাইবে, তখনই শুধু বুনিয়াদি বিদ্যালয় আরম্ভ করিতে হইবে।

(১২) অভিজ্ঞতার উপর শিক্ষাসূচী পরিশোধিত করিতে হইবে।

(১৩) বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে ইংরাজী ইচ্ছাধীন বিষয় হিসাবে দেওয়া হইবে না।

(১৪) বর্তমানের মত গভর্ণমেণ্ট ধর্মশিক্ষা দিবার সকল সুযোগ করিয়া দিবেন, কিন্তু খরচ দিবেন না।

(১৫) শিক্ষার কাল শেষ হইলে একটা পরীক্ষা লইয়া বিদ্যালয় ত্যাগের সার্টিফিকেট দিতে হইবে।

(১৬) পঞ্চম শ্রেণীর (১১ বৎসর) শেষে যাহারা অন্য বিদ্যালয়ে যাইতে ইচ্ছুক, তাহাদের বিদ্যালয় ত্যাগের সার্টিফিকেট দিতে হইবে।

(১৭) এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া ব্যাপার বিদ্যালয়ই স্থির করিবে।

দ্বিতীয় কমিটি :—

(১) বুনিয়াদি শিক্ষার পূর্বের অবস্থার জন্য নার্সারী ও শিশুবিদ্যালয় যদিও খুব প্রয়োজন কিন্তু ইহাকে এখনই বাধ্যতা-মূলকভাবে প্রবর্তন করার মত টাকা ও ট্রেণিংপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রীর একান্ত অভাব। প্রাদেশিক সরকার (ক) উপযুক্তস্থানে আদর্শ শিশু ও নার্সারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার দিকে দৃষ্টি রাখিবেন, (খ) উপযুক্ত ট্রেণিংপ্রাপ্ত শিশু-শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহ করিবেন। (গ) নির্ধারিত বয়সের নিম্নবয়সের শিশুকে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে উদ্বুদ্ধ করিবেন, (ঘ) উপযুক্ত নার্সারী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য প্রচারকার্য চালাইবেন।

(২) বুনিয়াদি শিক্ষা ৬ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত ৮ বৎসর ধরিয়া চলিবে এবং ইহার মূল ঐক্য বজায় রাখিয়া ইহাকে দুই ভাগে ভাগ করা হইবে—পাঁচ বৎসরের জুনিয়ার স্টেজ, তিন বৎসরের সিনিয়ার স্টেজ।

(৩) বুনিয়াদি বিদ্যালয় হইতে অন্যত্র যাইতে হইলে পঞ্চমশ্রেণী অর্থাৎ জুনিয়ার স্টেজ শেষ করিয়া যাইতে হইবে।

(৪) সিনিয়ার বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য রান্না, কাপড় চোপড় ধোলাইর কাজ, সূঁচের কাজ, গৃহশিল্প, শিশুরক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হইবে।

(৫) বিদ্যালয়ে প্রস্তুত দ্রব্যাদির বিক্রয়ের জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একটি কেন্দ্রীয় বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা দরকার।

(৬) প্রত্যেক প্রদেশের নূতন নূতন গবেষণার দিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য একটি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি থাকিবে। হিন্দুস্থানী তালিমি সঙ্ঘের একজন প্রতিনিধি এই কমিটিতে থাকিবেন।

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা

ভারতবর্ষে শিক্ষা-পরিকল্পনার একটি বিশেষ ত্রুটি এই যে শিশুর জীবনের যে সময়টিতে তাহার মনে ছাপ পড়ে, মন নরম থাকে এবং কোন কিছু গ্রহণ করিবার জন্য উন্মুখ থাকে, সেই সময়ে শিশুর জীবন সম্বন্ধে একটুকুও মনোযোগ দেওয়া হয় না। ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক দেশেই আজ একথা স্বীকৃত হইয়াছে যে প্রত্যেক শিক্ষা-ব্যবস্থাতে নার্সারী বা শিশু বিদ্যালয়ের স্থান মস্ত বড়। রাশিয়ার নাম এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ; সেখানে কিনডারগারটেন ও নার্সারী শিক্ষাব্যবস্থা খুব উন্নতি লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের বাহিরে অন্যান্য দেশে জনশিক্ষার গঠন কার্যে নার্সারী-স্কুল তাহার নিজের সুনির্দিষ্ট স্থানটি অধিকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু এদেশে দেশের অধিবাসীর শিশুকাল হইতেই দেহমনের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজনীয়তা আজও দেশের দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন কর্তৃপক্ষকেও বুঝাইতে হয়। সরকারী ঔদাসিন্যই ইহার একমাত্র কারণ নয় ; দেশে এ-বিষয়ে যাহারা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট তাহাদের অজ্ঞতা ও ঔদাসিন্যই দেশের বর্তমান এই দুরবস্থার জন্য দায়ী। যদি উপযুক্ত সুবিধা দেওয়াও যায় তথাপি ভারতীয় মাতা তাহার স্নেহের কোল হইতে সন্তানকে তাহার দৈহিক ও মানসিক উন্নতির জন্য

ছাড়িয়া দিতে রাজী হইবে না। প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতিকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে সমস্ত দেশে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যাপক প্রচারকার্য চালাইতে হইবে।

ছয় বৎসরের পূর্বে শিশুর শিক্ষার প্রয়োজন তাহার দৈহিক প্রয়োজনের দিক হইতে খুব বেশি। এই সময় শিশুর মধ্যে কতকগুলি ত্রুটি আত্মপ্রকাশ করে যাহা অচিরে দূর করা দরকার। তাই প্রাথমিক শিক্ষাদানের পূর্বেই শিশুর জন্য নার্সারী বিদ্যালয় বিশেষ প্রয়োজনীয়। শহর এবং যে সকল স্থানে গৃহের অবস্থা অস্বাস্থ্যকর, সেখানকার শিশুদের জন্য নার্সারী বিদ্যালয় বিশেষভাবে দরকার। আবার গ্রামে যেখানে মেয়েরা বেশির ভাগ সময়ই মাঠে কাটায় এবং উপযুক্ত গৃহও যাহাদের নাই, নার্সারী বিদ্যালয়ের প্রয়োজন তাহাদেরও খুব বেশি।

কেন্দ্রীয় এড্ভাইসারি বোর্ডের দ্বিতীয় কমিটি ইহার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছিল, যদিও এবিষয়ে সরকারী দায়িত্বের গুরুত্ব তাহারা ধরিতে পারে নাই। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এক্ষেত্রে বিশেষ কাজ হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

শিশুদের স্বাস্থ্য বাদ দিয়া মায়েদের দিক হইতেও নার্সারী বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। গৃহের কাজের ঠেকায় সমাজের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির সাহায্য কাজে নারী তাহার উপযুক্ত স্থান লইতে পারিবে না, ইহা দুঃখের কথা ; আবার এই কাজে গৃহকর্মে বিচ্যুতি ঘটে তাহাও অনুচিত। অতএব ভবিষ্যৎ নাগরিককে সকল দিক দিয়া যোগ্য করিয়া তুলিবার

কাজ সরকারের। প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামপূর্ণ ও ভাল শিক্ষয়িত্রী দ্বারা চালিত নার্সারী স্কুলের সাহায্যেই তাহা করা যাইতে পারে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষের শিক্ষাদীক্ষায় যে খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করে তাহা জানা কথা। তাই কচি বয়সের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত করা একান্ত প্রয়োজন এবং বাড়ীতে তাহা যদি সম্ভব না হয় তবে সরকারকেই সে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যে স্থানের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ও যেখানে ছাত্রসংখ্যা বেশি হইবে তেমন স্থানই নার্সারী বিদ্যালয় স্থাপন করার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

আমাদের গ্রামগুলি ঘনবসতিপূর্ণ নয়, যানবাহনের অসুবিধাও খুব বেশি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বেশি দূর হাটিয়াও যাইতে পারিবে না, তাই পল্লী অঞ্চলে নার্সারী বিদ্যালয় পৃথকভাবে না করিয়া জুনিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে নার্সারী ক্লাশ যোগ করিয়া দিতে হইবে। জুনিয়ার বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের সর্বনিম্ন শ্রেণীই নার্সারী শিশু শ্রেণী বলিয়া বিবেচিত হইবে। নার্সারী বিদ্যালয় বর্তমান সময়ে শহরে রীতিমতভাবে স্থাপন করিতে হইবে। ইহা জুনিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গেই করা যাইতে পারে, এমন কি তাহারই একটা বিভাগ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কেননা তাহা হইলে বড় বড় ছেলেমেয়েরা তাহাদের ছোট ছোট ভাইবোনদের বিদ্যালয়ে দেওয়া নেওয়ার কাজে সাহায্য করিতে পারিবে।

নার্সারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্যে একমাত্র শিক্ষয়িত্রীই

থাকিবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কচি শিশুদের যত্ন লইতে একমাত্র তাহারাই উপযুক্ত। কিন্তু শিক্ষয়িত্রীদের এজন্য বিশেষ শিক্ষা ও ট্রেণিং দিতে হইবে। ভারতবর্ষে বর্তমানে ট্রেণিংপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রীর বিশেষ অভাব আছে। দেশের শিক্ষার পুনর্গঠন কাজে এইরূপ ট্রেণিং-প্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রী যোগাড় করা একটা মস্তবড় কাজ।

সরকারের কর্তব্যের পরেও জনসাধারণের করণীয় আছে। বেসরকারী যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে তাহা খুবই প্রশংসনীয়। উপস্থিত যে কয়টি আছে তাহাদের মধ্যে বাঙ্গালাদেশের ভারতীয়দের জন্য জিতেন্দ্রনারায়ণ রায় শিশু ও নার্সারী বিদ্যালয়, বেনারসের রাজঘাট বিদ্যালয় ও শিশুদের হোষ্টেল এবং আডিয়ার বেসাণ্ট থিওসোফিক্যাল স্কুলের শিশু বিভাগের নাম উল্লেখযোগ্য। এইগুলিতে মণ্টেসরী নীতি অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

এইরূপ শিশুদের কোন পুঁথিগত পাঠদান অপেক্ষা নানারূপ অভিজ্ঞতা দান করাই বিশেষ দরকার। তাহাদের দৈহিক যত্ন, সু-অভ্যাস গঠন করান এবং নানারূপ কৌতূহল-সূচক কাজের মধ্য দিয়া তাহাদের অভিজ্ঞতা বাড়ান দরকার। সেই সমস্ত কৌতূহলদ্দীপক কাজের মধ্যে এইগুলি দেওয়া যাইবে—অভিনয় ও গান, শারীরিক ব্যায়াম, খেলাধূলা ও নাচ, ফুলগাছ ও জীবজন্তুর যত্ন লওয়া, নানারূপ অঙ্কন এবং এটা ওটা দ্রব্য প্রস্তুত করা। এই সব কাজকর্মে তাহাদের যে অভিজ্ঞতা জন্মে তাহাতে নিজেদের ক্রমবর্ধমান শক্তির উপর তাহাদের

বিশ্বাস বাড়িয়া যায়। এই সমস্ত নার্সারী বিদ্যালয়গুলি মধুর এবং আনন্দপূর্ণ হওয়া দরকার এবং মায়েরা গৃহে যাহা করিয়া উঠিতে পারে না কিন্তু যাহা করিলে তাহারা খুশি হয়, শিশুদের জন্য এমন কিছু করাতেই এই বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজন। এই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া বা অঙ্ক শিক্ষা দিবার জন্য কোন নিয়মিত শিক্ষার ধারা একেবারেই দরকার নাই। কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলির সম্বন্ধে ট্রেণিং দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবার শক্তি বাড়াইয়া, দশজনের সঙ্গে একসাথে থাকিবার শিক্ষা দিয়া, এবং শিক্ষামূলক নিয়ন্ত্রিত পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গ দান করিয়া শিশুর একটি সার্বজনীন উন্নতি—মানসিক, সামাজিক এবং দৈহিক—বিধান করিতে হইবে। প্রাক্-প্রাথমিক অবস্থায় এইরূপ একটি শিক্ষা দিতে পারিলেই পরবর্তী শিক্ষা শিশুর যথার্থ কল্যাণ করিবে এবং তাহা গ্রহণ করা তাহার পক্ষে সহজ হইবে।

এই নার্সারী বিদ্যালয়ের শিশুদের বয়স কত হইবে তাহা একেবারে স্থির করিয়া দেওয়া চলে না। তবে সাধারণভাবে তিন হইতে ছয় বৎসর এই নার্সারী বিদ্যালয়ের জন্য ধরা যাইতে পারে। ব্রিটেন এবং অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশে পাঁচ বৎসর হইতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা আরম্ভ হয়। ইহার পূর্বের বয়সের জন্য নার্সারী স্কুল। কিন্তু যে সকল ছেলে মেয়েদের বয়স ৫ বৎসরের বেশি হইয়া গিয়াছে, অথচ বয়সানুরূপ শিক্ষা পায় নাই, তাহাদের জন্য শিশু-ক্লাশ করা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে এরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর হয় না। এখানে ৬ বৎসর হইতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা আরম্ভ হইবে; যদিও ইচ্ছা হইলে ইহার

পূর্বেই আরম্ভ করা যায়। অতএব ৩ বৎসরের মত বয়স হইতে ৬ বৎসর পর্যন্ত সময় নার্সারী স্কুলের জন্য নির্ধারিত হইল। ১৯৪১এর হিসাবে দেখা গিয়াছে যে বৃটিশ-ভারতে পল্লী অঞ্চলে এই বয়সের ২,১৩,০৪,০০০ এবং শহর অঞ্চলে ৩১,০০,০০০, শিশু আছে। ইংলণ্ডে এই-জাতীয় প্রতি সাতজনের মধ্যে একজন শিশু স্বেচ্ছায় বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়। যদি এই হিসাব আমাদের দেশের জন্যও স্বীকার করা যায় তবে তিন হইতে ছয় বৎসরের শিশুর সংখ্যা হইবে ৩৫,০০,০০০। এই সংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশের জন্য বর্তমানে নার্সারী বিদ্যালয় ও ক্লাশের ব্যবস্থা করিলেই হইবে। জুনিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত ৪২·৫ টাকা প্রতি শিক্ষকের বেতন হইলে এস্থানেও প্রতি শিশুর জন্য বৎসরে ৩১·৮৪ টাকা খরচ হইবে। অবশ্য শহরে খরচ কিছু বেশি বলিয়া এবং নার্সারী বিদ্যালয় শহরেই বেশি থাকিবে বলিয়া খরচ আরও কিছু বেশি হইবে। তাছাড়া নার্সারী বিদ্যালয়ে স্থান এবং জিনিসপত্রাদি অনেক বেশি লাগে। ইহাতেও খরচ কিছু বেশি পড়িবে। এই সকল কারণে যে খরচ দেখান হইয়াছে, তাহা পরীক্ষামূলক বলিয়া ধরিতে হইবে।

সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষাপরিষদের যুদ্ধোত্তর শিক্ষাপরি-কল্পনা মোটামুটি বিবৃত করা হইল। কমিটি আমাদের বহু সমস্যাই আলোচনা করিয়া সে সম্বন্ধে তাহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। এতদিন পর্যন্ত যে সকল অনেক সমস্যাই শিক্ষা-বিভাগের নজরের বাহিরে ছিল, সেরূপ অনেক সমস্যা সম্বন্ধেই

এই পরিকল্পনায় আলোচনা আছে। কিন্তু এরূপ ব্যাপক আলোচনা দেখিয়াও আমাদের প্রাণে ভরসা আসে না। এড্ভাইসরি কমিটির পরিকল্পনা ও তাহার সত্যিকার রূপগ্রহণের মধ্যে ব্যবধানও যেমন কম নয়, অন্তরায়ও অনেক। সরকার কমিটির এই পরিকল্পনা কিরূপভাবে গ্রহণ করেন এবং কবে কতখানি সহৃদয়তা লইয়া ইহা আরম্ভ করেন, তাহার মীমাংসা এখনও হয় নাই। এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে বড়লাট যে দুই একটি কথা বলিয়াছেন তাহাতে ইতিমধ্যেই ইহার অনেকখানি উত্তাপ কমিয়া গিয়াছে। বহুবর্ষ আগে একদিন পরলোকগত গোখেল মহাশয়ের প্রাথমিক শিক্ষাবিলও সরকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তখনও অর্থের অভাব ছিল। সে অর্থ আজই কি পাওয়া যাইবে? ভারতসরকারের শিক্ষা সম্পর্কীয় এড্ভাইসর মিঃ জন সার্জেণ্ট অর্থের সম্পর্কে বলিয়াছেন যে ভারতরক্ষা কল্পে সরকার যে টাকা খরচ করিতেছেন, তাহার কতক অংশ এই শিক্ষার জন্য খরচ করিলেই অর্থের সমস্যার সমাধান হয়। এই বার্ষিক ৩১২ কোটি টাকার সংগ্রহ সম্পর্কে কমিটির মত এই যে মানুষের কোন প্রয়োজনবোধ যখন তীব্র হয়, তখন তাহা লাভ করিবার উপায়ও তাহার হইয়া যায়। কিন্তু এতবড় একটা পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে যেরূপ মনোভাবের প্রয়োজন, তাহা কোথায় পাওয়া যাইবে? এই পরিকল্পনাকে রূপ দিবার দায়িত্ব যে কাহার উপর থাকিবে মিঃ সার্জেণ্ট সে সম্বন্ধে আমাদের কোন আশ্বাস দেন নাই। দীর্ঘদিন ইহা সরকারের বিবেচনাধীন হইয়া পড়িয়া না থাকে।

ইহা ব্যতীত ইহা সমগ্রভাবে প্রয়োগ করিতে চল্লিশবৎসর ব্যাপী সময় লাগিবে। এরূপ দীর্ঘকালের কোন পরিকল্পনায় কোন কাজই সম্ভব হইতে পারে কিনা তাহা বিবেচ্য। সময়, অর্থ ও কর্মকর্তা এই তিন প্রধান ব্যাপারেই নিশ্চয় করিয়া কোন ভরসা পাওয়া যায় নাই। এসব দিকে ওয়ার্ধা পরিকল্পনা অনেক বেশি কার্যকরী। এই ত্রুটি বাদ দিলে কমিটি জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিকের উন্নতির কথা স্মরণ রাখিয়া যেভাবে প্রতিটি দিক আলোচনা করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। আমাদের যে কতদিকের কত প্রয়োজন রহিয়াছে, বিদেশের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় এই পরিকল্পনাও যে নাগরিকত্ব লাভের ন্যূনতম উপায় মাত্র, পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকের বিস্তৃত আলোচনা হইতে আমরা তাহা জানিতে পারিব। আমাদের জনসাধারণের পক্ষে ইহাও মস্তবড় লাভ; কেননা আমাদের প্রয়োজন সম্বন্ধেও আমরা অবহিত নই।

গ্রন্থ নির্ঘণ্ট

1. Modern Education in small Rural School —Kate V. Wofford.
2. Suggestions for Primary School Teachers in India—H. Dippie.
3. Suggestions for the Teaching of the Mother tongue in India—W. M. Ryburn.
4. The Teaching of Reading by Sentence Method—Edith Luke.
5. Children We Teach—Susan Isaacs.
6. The Year Book of Education 1940.
7. Testing Results in infant School —D. E. M. Gardner.
8. Handbook of Child Psychology —Carl Murchison.
9. Schools of Tomorrow —John & Evelyn Dewey.
10. Modern Development in Educational Practice —John Adam.
11. Experience in Education—John Dewey.

12. Groundwork of Educational Psychology
—J. S. Ross.

13. Report of the Director of Public Instruction
1940-41.

14. History of Education in Ancient India
—A. S. Altekar.

15. Primary Education in India
—J. M. Sen Gupta.

16. The Wardha Scheme of Education
—C. J. Varkey.

17. Postwar Educational Development in India
—Report by the Central Advisory Board.

18. আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা—অনাথনাথ বসু।

19. শিক্ষা—রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত।

20. আধুনিক শিক্ষক—খান বাহাদুর আবদুল হাকিম।

21. নূতন শিক্ষা প্রণালী—প্রমথনাথ দাশগুপ্ত।

22. শিক্ষা-বিজ্ঞান—খান বাহাদুর আবদুর রহমান।